শ্রমিক শ্রেণীর মুখপত্র

শ্রমিকশক্তি

৭ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা | জুন-জুলাই ২০০৯ | বিনিময়: ২ টাকা

সরকার পরিবর্তন নয়, নীতি পরিবর্তনের জন্য

জোট বাঁধো, তৈরী হও

কুশল দেবনাথ

পঞ্চদশ লোকসভা নির্বাচন সমাপ্ত। কেন্দ্রে কংগ্রেসের নেতৃত্বে নতুন সরকার গঠন করাও হয়ে গেছে। চতুর্দশ লোকসভার থেকে তুলনামূলকভাবে শক্তি বাড়িয়ে কংগ্রেসের নেতৃত্বে কেন্দ্রে সরকার গঠিত হয়েছে। কংগ্রেসের বিজয়ের পর বড় সংবাদপত্রগুলি বলতে শুরু করেছে এই জয় সোনিয়া-মনমোহনের নীতির জয়। গ্রামের গরীবদের জন্য ১০০ দিনের কাজ, ৬০০০০ কোটি টাকা কৃষিঋণ মকুব এবং সংখ্যালঘু ভোট— এই তিন রসায়নেই নাকি কংগ্রেসের এই বিজয়। কেন এই বিজয় তা এক কথায় বলা সম্ভব নয়। এতবড় দেশে নানা রসায়নের জন্য জয়-পরাজয় ঘটে। যারা বলছেন কংগ্রেসের এবং তাদের নীতির এককভাবে বিপুল জয় হয়েছে, তারা সত্য গুলিয়ে দিতে চাইছেন। এবারও কেন্দ্রে জোট সরকারই গঠিত হয়েছে। কংগ্রেস দল একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা পায়নি। দ্বিতীয়তঃ গোটা দেশে কংগ্রেসের সিট বাড়লেও সেই অর্থে হাওয়া বলে কিছু ছিল না। আমরা যদি এবারের নির্বাচনে দেখি তাহলে দেখব কংগ্রেস সবচেয়ে ভালো ফল করেছে অন্ধ্র, হরিয়ানা, কেরল, পঞ্জাব, রাজস্থান, দিল্লীতে। এখানে ১১৭ টা সিটের মধ্যে পেয়েছে ৮৭ টা। অপর দিকে বিহার, ছত্তিশগড়, ঝাড়খন্ড, গুজরাট, হিমাচল প্রদেশ, কর্ণাটক, জম্মু-কাশ্মীর, মধ্যপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র, উড়িষ্যা, তামিলনাড়ু, উত্তরপ্রদেশে ৩৪৬ টি আসনে কংগ্রেস পেয়েছে ৮৮ টা। আবার এখানে বিজেপি পেয়েছে ১১৩ টা। এর মধ্যে বিহার, ছত্তিশগড়, ঝাড়খন্ড, কর্ণাটক, উড়িষ্যায় কংগ্রেসের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। সুতরাং তথ্য থেকে পরিষ্কার কংগ্রেসের হাওয়া বলে গোটা দেশে কিছু ছিল না। তৃতীয়তঃ বিগত কয়েক বছরে কংগ্রেসের যে জনস্বার্থবিরোধী নীতির জন্য গোটা দেশের সাধারণ মানুষ ভয়ংকর ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে সেই বিষয়গুলি নির্বাচনে প্রধান অ্যাজেন্ডায় কংগ্রেস বিরোধী রাজনৈতিক শক্তি সামনে আনেনি। কারণ কংগ্রেসের ঐ নীতিগুলোর সাথে বিজেপি বা সি পি আই (এম) দলের যেহেতু নৈতিক কোনো তফাৎ নেই তাই সেগুলো ভোটের প্রধান বিষয় হয়ে ওঠেনি। যেমন সেজ আইন এবং জাতীয় কৃষিনীতি, বীজ বিল ইত্যাদি। ফলে কংগ্রেসকে তেমন রাজনৈতিক আক্রমণ সামলাতে হয়নি। সুতরাং নানা ভোট ভাগাভাগি, বিভিন্ন রং-বেরং এর জোটের কারণে কংগ্রেসের কিছু সিট বেড়েছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় মহারাষ্ট্রের কথা। রাজ ঠাকরে ১৫ শতাংশ ভোট পেয়েছে, ফলে শিবসেনা অন্ততঃ ৭ টি সিটে হেরেছে। ফলে কংগ্রেস-এন সি পি-র জোট বেশী আসন পেয়েছে। আবার অন্ধ্রে চিরঞ্জীবীর প্রজারাজ্যম দলের জন্য মুখ থুবড়ে পড়েছে তেলেগু দেশম পার্টি। সিট বেড়েছে কংগ্রেসের। কিন্তু এই সমস্ত সত্যকে এড়িয়ে

শেষাংশ ৬ পৃষ্ঠায়

কি করে বাঁচবে সুন্দরবন?

পরিমল মিস্ত্রী

সুন্দরবনে ঝড়, বন্যা, নদীবাঁধ ভেঙে যাওয়া—এসব নতুন কোন ঘটনা নয়। আমার জীবন কেটেছে সুন্দরবনে। অনেক প্রাকৃতিক দুর্যোগ দেখেছি। কিন্তু এত ক্ষয়ক্ষতি আগে কখনো হয়নি। কিছু নেই মানুষের, সর্বস্ব খোয়া গেছে। জলের এত গতি যে মানুষ তার কোনও জিনিসই রক্ষা করতে পারেনি, বাঁচানো যায়নি গবাদি পশুগুলোকেও। মাটির ঘর তো নব্বই ভাগ কেন, একশো ভাগই জলে ধুয়ে গেছে বলা যায়।

ছোটবেলা থেকেই সুন্দরবনের মানুষের মানুষের সুখে-দুঃখে-জীবনসংগ্রামে জড়িয়ে আছি আমি। কিন্তু সুন্দরবনের মানুষকে এত ভেঙ্গে পড়তে আগে কখনো দেখিনি। সুন্দরবনের লড়াকু মানুষ যেন কিছুটা নড়বড়ে হয়ে গেছে। বহু মানুষ দ্বীপ ছেড়ে চলে যাচ্ছেন। জমিজমা যাদের আছে, তারা তবু থাকবার চেষ্টা করছে। কিন্তু ভূমিহীন এবং যুবকদের দ্বীপ ছেড়ে চলে যাওয়ার প্রবণতা বেশী। লড়াইয়ের মূল শক্তি এভাবে চলে গেলে আগামীদিনে যেকোনো লড়াই গড়ে তোলাই তো কঠিন হয়ে যাবে।

ঝড়ের পরে প্রায় দিন সাতেক মানুষের মধ্যে কোন প্রাণের সাড়া ছিল না। নতুন করে ঘর বাঁধার আগ্রহও যেন মানুষ হারিয়ে ফেলে ছিল। পরে অবশ্য মানুষ আবার ধীরে ধীরে নতুন চালা বানানোর উদ্যোগ শুরু

শেষাংশ ৭ পৃষ্ঠায়

লালগড়

যৌথবাহিনীর সন্ত্রাস, স্বৈরতন্ত্রের পদধ্বনি

নিজস্ব প্রতিনিধি: অবশেষে এবার নির্বাচন মিটে যাওয়ার পরেই কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের যৌথ বাহিনীর ভয়াবহ সন্ত্রাস নেমে এল লালগড়ে। দীর্ঘদিন ধরে পুলিশ বয়কট চলে আসার পর এতদিনে রাজ্য ও কেন্দ্র সরকার নানা ধরণের বিশেষ বাহিনী নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লো সেই বয়কট এবং অবরোধ আন্দোলন ভাঙ্গতে। মাওবাদী দমনের যুক্তি উচ্চারিত হয়েছে তাদের তরফে। অন্যদিকে সিপিআই মাওবাদী দলকে কেন্দ্র সরকার সন্ত্রাসবাদী সংগঠন হিসেবে চিহ্নিত করে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে, সিপিএম প্রথমে রাজনৈতিকভাবে

শেষাংশ ৬ পৃষ্ঠায়

নির্বাচনে জিতেই কেন্দ্রীয় সরকারের উপহার!

নতুন ৯টি সেজ-এর ছাড়পত্র

বিশেষ প্রতিবেদন: নতুন সরকার গঠন হতে না হতেই কেন্দ্রীয় সরকার ৯টি নতুন বিশেষ আর্থিক অঞ্চল তৈরীর অনুমোদন দিয়ে দিল। এদের মধ্যে অধিকাংশই। মূলতঃ মহারাষ্ট্র, কর্ণাটক, কেরালা, অন্ধ্র প্রদেশে তথ্যপ্রযুক্তি সংক্রান্ত আর কিছু জৈব প্রযুক্তি সংক্রান্ত এই এসইজেডগুলি ছাড়পত্র মিলেছে।

বিজেপির প্রস্তাবের আদলে কংগ্রেসের পূর্ববর্তী শাসনকালে ২০০৫ সালে এসইজেড আইন তৈরী হয়, এবং তাকে সমর্থন জানিয়েছিল সমস্ত সংসদীয় রাজনৈতিক দলগুলো। এরাজ্যে অবশ্য ২০০৩ সালেই বামফ্রন্ট সরকার একটি বিল নিয়ে আসে এ ব্যাপারে।

গত কয়েক বছর আমরা দেখলাম সারা ভারত জুড়ে এসইজেড-এর বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষের একের পর এক প্রতিবাদ-লড়াইয়ের কাহিনী। অথচ, আবার সেজ-এর অনুমতি দেওয়া শুরু হল। এবং আশ্চর্যজনকভাবে যে তৃণমূল কংগ্রেস সেজ-এর বিরোধিতার কথা বলছে, তারাও সরকারের জোটসঙ্গী হয়ে এবিষয়ে টুঁ শব্দটি করলো না।

গণবন্টন ব্যবস্থা ধ্বংসের ইঙ্গিত

বিশেষ প্রতিবেদন: পঞ্চদশ লোকসভা নির্বাচন পরবর্তী ইউ. পি. এ. সরকারের যোজনা কমিশন ভারতবর্ষের রেশনিং ব্যবস্থার বদলে বি.পি.এল. তালিকাভুক্ত দেশবাসীকে খাদ্যশস্যের পরিবর্তে সমপরিমান অর্থ দেওয়ার পরিকল্পনা করছে। ফলে বি.পি.এল. তালিকাভুক্ত দেশবাসীকে সরাসরি বাজার থেকে খাদ্যশস্য ক্রয় করতে হবে। যেখানে ফুড কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া আবার এই বাজারেই তাদের সংগৃহীত খাদ্যশস্য বিক্রী করে। এর ফলে গরীব দেশবাসীকে বাজারের খাদ্যশস্য এবং সব্জির দামের ওঠাপড়ার অনিশ্চয়তার মধ্যে পড়তে হবে। রেশনিং ব্যবস্থা গরীব জনগনকে মূলত এই অনিশ্চয়তা থেকে বাঁচানোর জন্য চালু হলেও, আজ সরকার আবার দেশবাসীকে সেইদিকেই ঠেলে দিচ্ছে। কারণ সরকারের হাতে বাজারের খাদ্যশস্য এবং সব্জির দাম নিয়ন্ত্রন করার কোনো ব্যবস্থাই নেই, সমস্তই আড়তদারদের হাত দিয়ে নিয়ন্ত্রিত হয়। যোজনা কমিশনের এমন পদক্ষেপ শুধুমাত্র গরীব সাধারণ মানুষের সামাজিক সুরক্ষা কেড়ে নেওয়া ছাড়া আর কিছু নয়।

পাবলিক সেক্টরে বিলগ্নীকরণ

বিশেষ প্রতিবেদন: ইউ.পি.এ. সরকার ঘাটতি কমানোর জন্য ২০০৯-১০ আর্থিক বর্ষে বিভিন্ন পাবলিক সেক্টর কোম্পানীগুলোর সত্ত্ব বিক্রী করে প্রায় ২৫০০০ কোটি টাকা আয়ের পরিকল্পনা করেছে। সরকারী তরফে অবশ্য বলা হয়েছে যে শুধুমাত্র ঘাটতি কমানো উদ্দেশ্য নয়, পাবলিক সেক্টর কোম্পানীগুলির প্রসারের জন্যও এটা গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। সরকার বিএসএনএল, এমএমটিসি, এনএমডিসি, কোল ইন্ডিয়া, এনটিপিসি, ন্যালকো- এই কোম্পানীগুলির সত্ত্ব বিক্রী করেই টাকা তুলতে চাইছে। এদের মধ্যে শুধু বিএসএনএল এর ১০ শতাংশ মালিকানা বিক্রী করেই ২০,০০০ কোটি টাকা পাওয়া সম্ভব। সেবিও বিভিন্ন প্রাইভেট সংস্থাগুলিকে ক্লীনচিট দিয়ে বসে আছে। সরকারী এক কমিটির তরফে এক রিপোর্টে বলা হয়েছে যে প্রায় ২৫ টি সংস্থার মালিকানা সরকার বিক্রী করতে চলেছে। ভারত অ্যালুমিনিয়াম নামক সরকারী সংস্থাটির ৫১ শতাংশ মালিকানা ভারত সরকার 'বেদান্ত'কে বিক্রি করে দিয়েছে এবং চুক্তি অনুযায়ী বাকি মালিকানাও বিক্রি করবে।

প্রসঙ্গ—সিপিএমের নির্বাচন পরবর্তী আত্মসমীক্ষা

পিনাকী মিত্র

মুখবন্ধ

Aaxfl ®m¡Lpi¡ ¢eh¡QeJ fkcÙ ¢p ¢f Hjz f'¡ua ¢eh¡Qel d¡,¡ Hhw a‹ ¢ea "Bত্মpj£r¡'l fh®no Ll, n¢l¢L A¯eLÉl g¢Vg¡V¡গু®m¡u ®fjl fmf m¡¢N®u, eÉ¡e¡ ¢hc¡u Hhw ¢hj¡eh¡hl j¡eol L¡R h¡lwh¡l r j¡ Q¡Ju¡l ¢ecnL f¡bu Ll ¢p ¢f Hjl jdÉ kMe ¢gl Bp¢Rm f'¡uafh ®pC Bত্ম¢hn¡p,a¡fp£ j¡¢mLI ¢p¢X ®bL öl¦ Ll ph¡d plL¡ll ¢V¢i ®n¡, hÜh¡hl fL¡nÉ i¡oZ ®bL öl¦ Ll An¡Lh¡hl ®efbÉ i¡oZ - phaC kMe MS f¡Ju¡ k¡¢µRm '70 Hl A¢ja¡i বচ্চনpm i ®pC ®k¡n, ¢WL aMeC "®L¡b¡ qCa ¢L qCu¡ ®Nm, ¢p ¢f Hj ®m¡Lpi¡ ¢eh¡Qe dl¡n¡u£ qCu¡ ®Nm'z

¢p ¢f BC Hj HL¢V pwOhÜ l¡S¯e¢aL f¡¢Vz a¡l¡ k¡ Ll ¢eù¡il Hhw cmhÜi¡h Ll b¡Lz ®p¢V ¢nª¡ue ®q¡L h¡ Bত্ম-pj¡m¡Qe¡z a¡C ¢hj¡e hp ®bL Such hp, f¢mVhÉl¡ ®bL JLV pjbL - pLmC HMe ¢eSl ¢eSl ja Ll l ¢àa£u L¡S¢V Ll QmRez Ab¡v Bত্মসj£r¡z Bj¡l¡ HC ®mM¡u ¢h¢iæ Ùll Bত্মpj£r¡u jmaa ®k Lb¡গু®m¡ EW BpR ®pগু®m¡ ¢eu A¢hÙl ¢fHe¢f¢p LIhz ®h¡T¡l ®Qø¡ LIh ®pphl ®fRel l¡Se£¢aLz Bl a¡l p¡b p¡bC HLV Aj¡m¡m-¢N¢lJ LIa R¡sh e¡z Ab¡v i¢hoÉa ¢eu c-Q¡lV AL¡mf, Lj¾VJ HC ®mM¡l ®no b¡Lhz pঙ্গে b¡Lez

নির্বাচনী বিপর্যয় ও কংগ্রেস হাওয়া

Hh¡ll ¢eh¡Qe ¢p¢fHj Hl ¢hfkul L¡lZ ¢qph, gj¡m Hhw Cegj¡m, cC ÙlC HLV¡ ¢houL Mh গু l¦ত্ব ®cJu¡ quRz ®pV¡ qm— Hh¡ll ¢eh¡Qe ®cnSs ®k "Lw®Np q¡Ju¡' ¢Rm ®p¢VL hTa e¡ f¡l¡z hm¡ quR, ¢hfkul ¢fRe, HC hTa e¡ f¡l¡l HLV¡ i¢jL¡ BRz HV¡ hTa e¡ f¡l¡l gmC aa£u ফ্র¾V ¢eu Ha ®L¡jl ®hd ®ej¢Rme fL¡n L¡l¡az j¡u¡ha£, Q¾ch¡h ®b®L öl¦ Ll ®ÉeÉ¡uLl ja ®m¡LSeL ¢eu a¢sO¢s HLV h¡e¡e¡l ¢fRe ®p¡S¡ ¢qph HLV¡C ¢Rm, ®k, HC ¢eh¡Qe Lw®Npl i l¡X¢h qhz HC ফ্র¾Vl ¢fRe ¢p ¢f BC Hjl ®eah¾c kaC "fN¢an£m' aLj¡ p¡V¡l ®Qø¡ LI¦e e¡ ®Le, a¡l¡ ¢eSl¡J i¡m¡ LlC S¡eae ®k e£¢al ®bLJ a¡®cl L¡R AeL ®hn£ গুরুত্বের ¢Rm ph i¡la£u l¡Se£¢aa ¢eScl f¡p¢ঙ্গL l¡M¡z aa£u ফ্র¾V pঙ্গ£cl jdÉ j¡u¡ha£, Sum¢ma¡ a¡cl ce£¢al SeÉ LMÉ¡az Q¾ch¡h LMÉ¡a Ec¡l Abe£¢al fbj pgm Hhw A¢a EcÉ¡N£ l©fL¡l ¢qphz eh£el q¡a ®mN luR fú¡ Hhw L¢mঙ্গeNll LoL J B¢ch¡p£l lš²z ¢L¿' ®L e¡ S¡e ¢p ¢f BC Hjl q¡al ®R¡u¡u f¡blJ f¡Z Bp, lae V¡V¡J qe pj¡Sph£, a¡qm Su¡, j¡u¡, Q¾ch¡h h¡ eh£ecl fN¢an£m qJu¡ ¢L Hje L¢We L¡Sz gm Qmm A-Lw®Np£, A-¢hS¢f plL¡l Ns ®a¡m¡l jq¡(e)pwN¡jz N¡R L¡W¡m, ®N¡g ®aml

শেষাংশ ৫ পৃষ্ঠায়

সম্পাদকীয়
শ্রমিকশক্তি
৭ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা, জুন-জুলাই '০৯

প্রকৃত বিকল্পের জন্য কাজ করার এখনই উপযুক্ত সময়

নন্দীগ্রাম গণহত্যার প্রতিবাদে কলকাতার ঐতিহাসিক মিছিলে মানুষের ঢল দেখেই বোঝা যাচ্ছিল পশ্চিমবাংলার মানুষের চেতনায় পরিবর্তনের একটা বাতাবরণ তৈরি হয়েছে। উল্লেখ্য যে মিছিলে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বা তাঁর দল তৃণমূল কংগ্রেস কিন্তু অংশগ্রহণ করেনি। একথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে সিঙ্গুর নন্দীগ্রাম আন্দোলনের মধ্য দিয়ে যে প্রতিবাদী ঢেউ পশ্চিমবাংলায় তৈরি হয়েছিল তা গত লোকসভা নির্বাচনে ব্যাপক সিপিএম বিরোধী হাওয়া তৈরি করে এবং খুবই বিচক্ষণতার সঙ্গে মমতা ব্যানার্জী এবং তার দল তৃণমূল কংগ্রেস সেই হাওয়াকে কাজে লাগায়। নির্বাচনে সিপিএম পর্যুদস্ত হয়েছে। এতটাই পর্যুদস্ত যে এখন তারা একটি সংখ্যালঘু দল হিসাবে রাজ্যের ক্ষমতায় রয়েছে। ভোটের ফলাফলে এটা স্পষ্ট যে এ-রাজ্যের বামপন্থী মানুষদের একটা অংশ এবং সিপিএম থেকে বেরিয়ে আসা বেশি কিছু মানুষও তৃণমূল-কংগ্রেসকে ভোট দিয়েছেন। কেন? না, পরিবর্তনের জন্য। এরা কিন্তু তৃণমূল বা কংগ্রেস নয়। তীব্র সিপিএম বিরোধী হাওয়া, একদল বাম বুদ্ধিজীবীর তৃণমূলীকরণ এবং সর্বোপরি সংগ্রামী বামপন্থী দলগুলির রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক দুর্বলতা মানুষকে এই স্রোতে ভাসিয়ে নিয়ে গেছে। স্রোতের টান এতই তীব্র যে, যে কংগ্রেস কেন্দ্রে ক্ষমতায় থেকে, সিপিএম-এর সমর্থন নিয়ে সেজ আইন প্রণয়ন করল, যে কংগ্রেস উদারীকরণ-বেসরকারিকরণ-খুচরো ব্যবসায় বহুজাতিকদের অনুপ্রবেশ বা এককথায় বিশ্বায়নের মূল রূপকার, যে কংগ্রেস পশ্চিমবাংলার মানুষের কাছে একটি ঘৃণিত পার্টি তারা আজ তৃণমূলের সঙ্গে জোট বেঁধে হয়ে গেল 'পরিবর্তন'-এর কাণ্ডারী। অথচ নন্দীগ্রামে তো সেজ-ই করতে চেয়েছিল সরকার, যার বিরুদ্ধে মানুষ লড়লেন। একই জিনিস হচ্ছে আজ উড়িষ্যায়, মহারাষ্ট্রে, গুজরাটে বা অন্যান্য রাজ্যে, যার বিরুদ্ধে, সেইসব রাজ্যেও মরনপণ লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন সেখানকার মানুষ। খুচরো ব্যবসায় বহুজাতিকদের আগ্রাসন শুধু এরাজ্যে হচ্ছে তা তো নয় সারা দেশেই হচ্ছে এবং এর মূল রূপকার কেন্দ্রীয় স্তরে কংগ্রেস দল।

সুতরাং কংগ্রেসের হাত ধরে যে পরিবর্তনের কথা আজ বলা হচ্ছে তা আদতে কোন নীতির পরিবর্তন নয়। কথায় বলে 'যে যায় লঙ্কায় সেই হয় রাবণ'। তাহলে আমরা কি শুধু রাবণদেরই বদলাব, লঙ্কাটাকে বদলাব না? তবু মানুষের এই পরিবর্তন চাওয়াটা ইতিবাচক। রাজ্যের একটা বড়সংখ্যক মানুষ যেমন শুধু ভোট দিয়ে তাঁদের এই পরিবর্তনের চাহিদা ব্যক্ত করেছেন তেমনি সিঙ্গুর নন্দীগ্রামের মানুষ জীবন দিয়ে টাটা সালেমের মতো পুঁজিপতিদের বিরুদ্ধে লড়েছেন এবং বৃহৎ পুঁজিপতিদের স্বার্থরক্ষাকারী সরকারি নীতি ও সরকারি কর্মসূচীর বিরুদ্ধেও লড়েছেন। অর্থাৎ বৃহৎ পুঁজির বিরুদ্ধে শ্রেণীসংগ্রামেও মানুষ পিছপা নন। কিন্তু পুঁজিবাদের সমর্থক তৃণমূল কংগ্রেস কখনোই সেই শ্রেণীসংগ্রামকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে না, সে চায়ও না। সিঙ্গুর-নন্দীগ্রামের হাত ধরে দেশব্যাপী সেজ বিরোধী বা বিশ্বায়ন বিরোধী শ্রেণীসংগ্রামকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া তৃণমূলের কর্মসূচী নয়, সিপিএমকে হটিয়ে ক্ষমতার দখল নেওয়াটাই তার একমাত্র কর্মসূচী এবং সেই কাজ করার ক্ষেত্রে সে সফলও বটে।

আসলে এই বিশ্বায়ন বিরোধী, বৃহৎ পুঁজির বিরোধী সংগ্রামগুলিকে সঠিকপথে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারেন একমাত্র সংগ্রামী বামপন্থীরাই। হাজার দুর্বলতা সত্ত্বেও সংগ্রামী বামপন্থীদের মধ্যেই আছে সেই ক্ষমতা। এতদিন সিপিএম বামপন্থার মুখোশ পরে লালঝান্ডাকে ব্যবহার করে মানুষকে প্রতারিত করেছে। আজ মানুষ একটু একটু করে মোহমুক্ত হচ্ছেন। বিগত বেশ কয়েক বছর ধরে পশ্চিমবাংলার সংগ্রামী জনতার মধ্যে যে স্থবিরতা লক্ষ্য করা গিয়েছিল তা একটু একটু করে কাটছে। সংগ্রামী বামপন্থী শক্তিগুলির পক্ষে মানুষকে শ্রেণীসংগ্রামের পথে সংগঠিত করার এক চমৎকার পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। সেজ বিরোধী, জমি অধিগ্রহণ বিরোধী গণসংগ্রামগুলিকে সর্বভারতীয় স্তরে সংগঠিত করার বাস্তব প্রয়োজনীয়তা ও পরিস্থিতি দুইই তৈরি হয়েছে।

দক্ষিণপন্থীর হাত ধরে যেমন কোন প্রকৃত বিকল্প তৈরি হতে পারে না, তেমনই অধঃপতিত, পুঁজিবাদী পথের পথিক বিভিন্ন দল এবং মেকী বামপন্থীদের জোট তৃতীয় ফ্রন্টও কোন বিকল্প হতে পারে না। সংগ্রামী বামপন্থী শক্তিগুলির কর্তব্য তাই নিজেদের ঐক্য গড়ে তোলা এবং বিশ্বায়নী হামলার বিরুদ্ধে গড়ে ওঠা আন্দোলনগুলিতে তৃণমূলস্তরে অংশগ্রহণ করা, কোনরকম সংকীর্ণতা না রেখে আন্দোলনগুলির সামনের সারিতে বুক চিতিয়ে দাঁড়ানো আজ জরুরী। সাথে একটি বিকল্প নীতি, বিকল্প রাজনৈতিক বক্তব্য তৈরি করে বুদ্ধিজীবী থেকে মেহনতি মানুষ সকলকে সংগঠিত করার উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। রাজ্য থেকে সর্বভারতীয় স্তরে এই উদ্যোগ গ্রহণের বাস্তবতা তৈরি হয়েছে।

মানুষ সিপিএম-এর উপর ক্ষুব্ধ কারণ তারা আজকের পুঁজিবাদী কর্মসূচীগুলি রূপায়ণের জন্য জনগণের বিরুদ্ধে বৃহৎ পুঁজির পক্ষে অনেক বেশি আক্রমণাত্মক। একই ভূমিকা কংগ্রেস-বিজেপিও নিচ্ছে। তৃণমূল কংগ্রেস কেন্দ্রে সরকারে গিয়ে সেই নীতিই রূপায়ন করবে। রাজ্যে ক্ষমতায় এলেও সেই একই কাজ করবে। অচিরেই এদের শ্রেণিচরিত্রও সাধারণ মানুষের কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠবে। মানুষকে এখনই যদি একটি প্রকৃত বিকল্প রাজনীতিতে সংঘবদ্ধ করা না যায় তাহলে কিন্তু মানুষ আবারও এক চরম হতাশায় ডুবে যাবেন। নিষ্ক্রিয়তা গ্রাস করবে মানুষকে।

সুতরাং এখনই সেই সময় যখন সংগ্রামী বামপন্থীরা একটি বিকল্প রাজনীতিকে সামনে রেখে নিজেরা কাছাকাছি আসতে পারেন এবং সংগ্রামী জনতাকে শ্রেণীসংগ্রামের পথে সংঘবদ্ধ করতে পারেন।

শ্রমিকশ্রেণীর মুখপত্র
শ্রমিকশক্তি
৩৬/২ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-০৯
ফোন : +৯১-৯৪৩৩২৪২৪৯৮
ই-মেল : shramikshakti@gmail.com

জনপ্রতিনিধিরা সত্যিই কতটা জনপ্রতিনিধি?

কৃশাণু ব্যানার্জী

'তথ্যের অধিকার' বা 'রাইট টু ইনফরমেশন' নিয়ে বেশ কিছুদিন ধরে সমাজে বেশ নাড়াচাড়া চলছে। তারই একটা সুফল পাওয়া গেল সদ্য শেষ হওয়া লোকসভা নির্বাচনের সময়। নির্বাচন কমিশনের নির্দেশে সমস্ত প্রার্থীকে তার নিজের এবং পরিবারের (স্ত্রী/স্বামী এবং তাদের ওপর নির্ভরশীল) সম্পত্তি, বকেয়া, শিক্ষাগত যোগ্যতা এবং ক্রিমিনাল কেসের বিস্তারিত বিবরণ এফিডেভিট করে জমা দিতে হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ নির্বাচন কমিশন সেই যাবতীয় তথ্য তুলে দিয়েছে তাদের ওয়েবসাইটে।

মূল আলোচনায় যাওয়ার আগে কয়েকটা কথা বলে নেওয়া দরকার। প্রথমতঃ আমরা ধরে নিচ্ছি জনপ্রতিনিধি হওয়ার জন্য যারা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন তারা সঠিক তথ্যই নির্বাচন কমিশনকে জানিয়েছেন। কিন্তু নির্বাচন কমিশন তার কোন সঠিকতা বিচার করে কি? হলদিয়ার কুখ্যাত ডাকসাইটে সিপিএম নেতা লক্ষণ শেঠের মোট সম্পত্তি যখন শূন্য দেখানো হয়, তখন সন্দেহের অবকাশ থেকেই যায়। দ্বিতীয়তঃ অনেক প্রার্থীই ভুল তথ্য দেননি আবার প্রকৃত তথ্যও দেননি। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, দার্জিলিংয়ের কংগ্রেস প্রার্থী দাওয়া নরবুলার দুটি গাড়ি আছে, কিন্তু তার মূল্য জানানো হয়নি। কিন্তু আইনত গাড়ির মূল্যও জানানোর কথা ছিল। আবার আলিপুরদুয়ারের বামফ্রন্ট প্রার্থী মনোহর তিরকের স্ত্রীর নামে যে জমি আছে, তার ২০০২ সালের মূল্য দেখানো হয়েছে।

যাই হোক, মূল আলোচনায় আসা যাক। এখানে দলগতভাবে প্রার্থীদের গড় সম্পত্তি দেখানো হয়েছে।

দল	গড় সম্পত্তির পরিমাণ (টাকা)
তৃণমূল কংগ্রেস	১,১২,৬৩,৭৩৭
জাতীয় কংগ্রেস	৭৯,৪৮,৯৫০
বিজেপি	৬৭,৮৮,০৫২
বামফ্রন্ট	৩৮,৫৭,৬২০

তৃণমূল কংগ্রেসের মোট ২৮ জন প্রার্থীর (এসইউসিআই সহ) গড় সম্পত্তির পরিমাণ এক কোটি টাকার ওপরে। সবচেয়ে ধনী ব্যক্তি নূর আলম চৌধুরী। তার ও তার স্ত্রীর মোট সম্পত্তি ১০ কোটি ৪৪ লাখ (নগদ ৭ লাখ, ব্যাঙ্কে ১ কোটি ১০ লাখ, এনএসসি, পোস্টাল ১৬ লাখ, গয়না ১১ লাখ) আর স্থাবর ৮ কোটি (কৃষিজমি ৩৫ লাখ, অকৃষি জমি ১ কোটি, বাড়ি ৬ কোটি)। তৃণমূল কংগ্রেসের মোট ৭ জন প্রার্থীর সম্পত্তির পরিমাণ কোটি টাকার ওপরে। ৬ জনের সম্পত্তি দলীয় গড়ের ওপরে। দলনেত্রীর মোট সম্পত্তির পরিমাণ তুলনায় কম (৪,৭৩,১৯৭ টাকা)। তৃণমূলের সর্বোচ্চ ৫ জন সম্পত্তির মালিকের হিসেব দেওয়া হল।

কেন্দ্র	প্রার্থী	সম্পত্তি (টাকা)
ঘাটাল	নূর আলম চৌধুরী	১০,২৯,০০,০০০
হাওড়া	অম্বিকা ব্যানার্জী	৬,২৯,২৬,৬৭৪
ব্যারাকপুর	দীনেশ ত্রিবেদী	২,৭২,০৩,৯৩০
শ্রীরামপুর	কল্যাণ ব্যানার্জী	১,৬১,৪৬,২৬৬
বীরভূম	শতাব্দী রায়	১,৩১,৪৮,০০০

কংগ্রেসের মোট ১৪ জন প্রার্থীর সম্পত্তির গড় প্রায় ৮০ লাখের কাছাকাছি। কোটিপতি ৪ জন—বহরমপুরের অধীর চৌধুরী, জঙ্গীপুরের প্রণব মুখার্জী, রায়গঞ্জের দীপা দাসমুন্সী আর জলপাইগুড়ির সুখবিলাস বর্মা। ৬ জন প্রার্থীর সম্পত্তির পরিমাণ দলীয় গড়ের ওপরে।

বিজেপি প্রার্থীদের গড় সম্পত্তি ৬৭ লাখের কাছাকাছি। সর্বোচ্চ যশোবন্ত সিংহ—৮ কোটি ৩৫ লক্ষ। এছাড়াও কৃষ্ণনগরের সত্যব্রত মুখার্জী, যাদবপুরের সনৎ ভট্টাচার্য আর মুর্শিদাবাদের নির্মল কুমার সাহার সম্পত্তি ১ কোটির বেশী। ১০ জনের সম্পতির পরিমাণ দলীয় গড়ের ওপরে।

বামফ্রন্ট প্রার্থীদের গড় সম্পত্তি ৩৮ লাখের ওপরে। কোটিপতি ৪ জন। মোট ১২ জন প্রার্থীর সম্পত্তি দলীয় গড়ের চেয়ে বেশী। এখানে বামফ্রন্টের সর্বোচ্চ পাঁচ সম্পত্তির মালিকদের হিসেব দেওয়া হল।

কেন্দ্র	প্রার্থী	সম্পত্তি (টাকা)
বারাসাত	সুদিন চট্টোপাধ্যায়	১,৬৩,৪০,৪২৬
বসিরহাট	অজয় চক্রবর্তী	১,৫৩,৮৯,৪৪৮
ব্যারাকপুর	তড়িৎবরণ তোপদার	১,২৪,৩৪,০৭০
কৃষ্ণনগর	জ্যোতির্ময়ী সিকদার	১,০২,৯৪,৬৫৩
বর্ধমান পূর্ব	অনুপ কুমার সাহা	৮৬,২২,৯৪৪

এবার চোখ ফেরানো যাক অন্যদিকে। পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ মানুষের অবস্থা। বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য কয়েক বছর আগে নিজেই স্বীকার করেছিলেন, দারিদ্রসীমার নীচে বাস করেন রাজ্যের ৩৬ শতাংশ মানুষ। পশ্চিমবঙ্গের জনপ্রতি বাৎসরিক আয় ২০০৫-০৬ সালের হিসেবে ২৫,২৩৩ টাকা অর্থাৎ মাসে ২০০০ টাকার একটু বেশী। উল্লেখ্য, দারিদ্রসীমা মানে যাদের আয় বছরে ১৫০০০ টাকা বা তার কম। অর্থাৎ জনপ্রতি বাৎসরিক আয় দারিদ্রসীমার কিছুটা মাত্র ওপরে।

এই সমস্ত দলগুলোর পাশাপাশি আরো বহু দল নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেছে, যাদের অধিকাংশই শাসকশ্রেণীর রাজনীতির কথাই বলে, কিন্তু ভোট চায় গরীব মেহনতী সংখ্যাগুরু মানুষের।

আমরা মনে করি এই প্রতিষ্ঠিত রাজনৈতিক দলগুলো নয়, সংগ্রামী বামপন্থীরাই হয়ে উঠতে পারে জনগণের প্রকৃত আশা-আকাঙ্খার প্রতিনিধি। তা এবারের নির্বাচনে সংগ্রামী বামপন্থী বিভিন্ন শক্তির পক্ষ থেকেও প্রার্থী দাঁড়িয়েছিলেন। এই লেখায় তাদের সম্পত্তির হিসেবটাও দেওয়া দরকার। গড় সম্পত্তির পরিমাণ যেখানে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থীদের ১ কোটি ১২ লাখ, জাতীয় কংগ্রেসের প্রায় ৮০ লাখ, বিজেপির ৬৮ লাখ, বামফ্রন্টের ৩৯ লাখ— সেখানে সংগ্রামী বামপন্থী প্রার্থীদের গড় সম্পত্তির পরিমাণ ১ লাখ ৫৫ হাজার ৮৮ টাকা। সিপিআইএমএল লিবারেশনের প্রার্থীদের হিসেবটা এখানে ধরা হয়নি। বিহারে সিপিএমের সাথে তাদের সমঝোতার কারণে অনেক সংগ্রামী বাম দলই তাদের এই নির্বাচনে সমর্থন দিতে নারাজ ছিল। যদি তাদেরকে হিসেবে ধরি তাহলেও সংগ্রামী বামপন্থী প্রার্থীদেরগড় সম্পত্তির হিসেবটা দাঁড়ায় ৩ লাখ ১৬ হাজার ৪৮০ টাকা

অধিকাংশ প্রতিষ্ঠিত দলের প্রার্থীরাই সাধারন মানুষের তুলনায় বহুগুণ ধনী স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে এই জনপ্রতিনিধিরা 'মা-মাটি-মানুষের' জীবনের সমস্যা কতটা বোঝেন, কতটা অনুভব করেন আর কতটাই বা সংসদে তুলে ধরতে পারবেন। বামফ্রন্ট প্রার্থীদের সম্পত্তির পরিমাণও চমকে দেওয়ার মত। তৃণমূল, কংগ্রেস বা বিজেপির তুলনায় বামফ্রন্ট প্রার্থীদের সম্পত্তির গড় অল্প কম হলেও প্রার্থী বা প্রার্থীর পরিবারগুলি যে যথেষ্ট ধনী, সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। কংগ্রেস বা বিজেপি নাহয় বড়লোকদের প্রতিনিধি বলেই কুখ্যাত, কিন্তু যারা 'দুনিয়ার মজদুর এক হও' স্লোগানে আকাশ-বাতাস মুখরিত করেন, সেই বামফ্রন্টের প্রার্থীরাও সাধারণ মানুষের থেকে অনেক অনেক অবস্থাপন্ন। হতে পারে অনেক প্রার্থী উত্তরাধিকারসূত্রে সম্পত্তি পেয়েছেন। হতে পারে অনেকের স্ত্রী/স্বামীর নিজস্ব রোজগার আছে কিন্তু একথা বলাই যায় যে বেশীরভাগ প্রার্থী বা তাদের পরিবারগুলো সমাজের ধনী বা উচ্চবিত্ত অংশ থেকে আসা। সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনের যন্ত্রণা ও সমস্যাগুলো থেকে তাদের জীবনযাত্রা বহুযোজন দূরে—বন্ধ কলকারখানার বেঁচে থাকার লড়াই হোক বা কৃষকের ফসলের দাম না পাওয়ার যন্ত্রণা হোক বা বেকারের চাকরি না পাওয়ার জ্বালা, নাগরিক জীবনের পানীয় জল বা বিদ্যুতের সংকটজনিত সমস্যাই হোক।

তথ্যসূত্র:
http://59.90.59.52/GE/pclist.htm
http://myneta.info/west-bengal
http://timesofindia.indiatimes.com/articleshow/2979652906
http://pbplaning.gov.in/pdf/Ranking of States Current.pdf

টিটাগড় লুমটেক্স

লড়াকু শ্রমিকদের জয়

নিজস্ব প্রতিনিধি: টিটাগড় মাঠকলে (লুমটেক্স) ম্যানেজমেন্টের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে একটা পর্যায়ে জয়লাভ করলেন লড়াকু শ্রমিকরা। ম্যানেজার হত্যার অজুহাতে গেটবাহার ২৪ জন শ্রমিককে অবশেষে কাজে ফিরিয়ে নিতে বাধ্য হল ম্যানেজমেন্ট। গত ১৫ই মে ২০০৮ মিলগেটে সংগ্রামী মজদুর ইউনিয়নের গেট মিটিং চলাকালীন ম্যানেজমেন্টের পোষা গুন্ডাদের হামলা এবং তৎপরবর্তীতে কারখানার অভ্যন্তরে পার্সোনাল ম্যানেজার অপূর্ব রায়চৌধুরীর হত্যাকান্ডের পর থেকে দেড় বছর এই ২৪ জন শ্রমিককে কাজে যোগ দিতে দেয়নি ম্যানেজমেন্ট। ম্যানেজমেন্টের অভিযোগের ভিত্তিতে এই ২৪ জন শ্রমিক তিন মাস জেলও খাটেন এবং অবশেষে হাইকোর্ট তাঁদের জামিনে মুক্তি দেওয়ার নির্দেশ দেয়। তার পর থেকে কাজে ফিরিয়ে নেওয়ার দাবীতে সংগ্রামী মজদুর ইউনিয়নের নেতৃত্বে তাদের টানা লড়াই সাফল্যের মুখ দেখে যখন ৬ই জুন ম্যানেজমেন্ট গেটে নোটিস দিয়ে বিনা শর্তে সমস্ত গেটবাহার শ্রমিককে কাজে ফিরিয়ে নিতে বাধ্য হয়।

ঘটনার শুরু তখন থেকে যখন মাঠকল জুটমিলের সংগ্রামী শ্রমিকরা কিছু বিপ্লবী রাজনৈতিক কর্মীর সহায়তায় কারখানায় সংগ্রামী মজদুর ইউনিয়ন গড়ে তোলে। প্রতিষ্ঠিত ট্রেড ইউনিয়নগুলির মালিকের দালালিতে বীতশ্রদ্ধ হয়ে দলে দলে শ্রমিকরা এই নতুন ইউনিয়নে যোগদান করে। প্রভিডেন্ট ফান্ড, গ্র্যাচুইটির টাকা এবং অন্যান্য দাবী আদায়ের জন্য লড়াই মাঠকলে তীব্র হয়ে ওঠে। তখন থেকে ম্যানেজমেন্ট, সরকার, প্রশাসন, প্রতিষ্ঠিত রাজনৈতিক দল, তৎকালীন সাংসদ তড়িৎ তোপদারদের চক্র মাঠকলে শ্রমিকদের আন্দোলনকে ভাঙ্গতে সক্রিয় হতে থাকে। ম্যানেজার অপূর্ব রায়চৌধুরীকে খুনের দায়িত্বও তারা এই সংগ্রামী শ্রমিকদের ওপর চাপাতে সচেষ্ট হয়। এবং ঐ ঘটনায় বেছে বেছে এই নতুন ইউনিয়নের কর্তাব্যক্তিদের গ্রেপ্তার করা হয়। কিন্তু এত করেও আন্দোলন ভাঙ্গা সম্ভব হয়নি। ইউনিয়নের নেতৃত্বে শ্রমিকরা যেমন আইনী লড়াই চালায়, তেমনই মিটিং, মিছিল, ধর্ণা, অনশন প্রভৃতিও চলতে থাকে। দীর্ঘ এবং কঠিন লড়াইয়ের মধ্যে দিয়ে এই জয় শ্রমিক মহল্লায় খুশির জোয়ার এনে দিয়েছে। আর এই জয়ের উৎসাহের ওপর দাঁড়িয়ে প্রস্তুতি চলছে প্রভিডেন্ট ফান্ড, গ্র্যাচুইটি, লোন সহ মজুরীবৃদ্ধি ছিনিয়ে আনার লড়াইয়ের।

ডুয়ার্সের চা বাগান

কাজ হারিয়েছেন ১০ লাখ শ্রমিক

নিজস্ব প্রতিনিধি: ডুয়ার্সের চা বাগানগুলিতে বিগত কয়েক বছরে দশ লাখেরও বেশী শ্রমিক কাজ হারিয়েছেন এবং এখন ভয়াবহ দারিদ্র, অনাহার এবং রোগগ্রস্ত অবস্থায় দিন কাটাচ্ছেন বলে জানিয়েছেন জওহরলাল নেহেরু বিশ্ববি-দ্যালয়ের একটি পর্যবেক্ষক দল। গবেষকদের এই দলটিকে নেতৃত্ব দেন অধ্যাপক অমিতা সিং।

২০০০ সালের পর থেকে যত চা বাগান বন্ধ হয়েছে, তার ফলস্বরূপ ১৪০০ মানুষ অনাহারে বা তৎসংক্রান্ত কোন রোগে মারা গেছেন। ২০০০ সালে ডুয়ার্সে প্রথম চা বাগান বন্ধ হয়। তার পরবর্তী দুবছরে আরও ১৩টি চা বাগান বন্ধ হয়ে যায়, যার ফলশ্রুতি দাঁড়ায় দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি ও কোচবিহারের ৩০ লক্ষ মানুষ অসহায় অবস্থায় পড়েন। রাজ্য সরকার বা কেন্দ্র সরকার — কারোর তরফ থেকেই কিছু করা হয়নি। ওদিকে এবারের লোক-সভা নির্বাচনের আগে কংগ্রেসের তৎকালীন মন্ত্রী জয়রাম রমেশ ১৪টি চা বাগান খোলার ব্যাপারে শ্রমিক সমবায় গঠনের কথা বলেছিলেন। কিন্তু এখনও পর্যন্ত সেরকম কোন উদ্যোগ দেখা যায়নি।

ব্যারাকপুর নোনাচন্দনপুকুর বাজার

উচ্ছেদের বিরুদ্ধে লড়াই

নিজস্ব প্রতিনিধি: ব্যারাকপুরে নোনাচন্দন-পুকুর বাজারকে রিলায়েন্স কোম্পানীর হাতে তুলে দেওয়ার বিরুদ্ধে ২০০৬ সালের ডিসেম্বর মাস থেকে টানা লড়াই চালাচ্ছেন সেখানকার ব্যবসায়ীরা। ৪০ বছরের পুরনো এই বাজারের ৫০০ দোকানদারকে উচ্ছেদ করে বাজারটিকে ব্যক্তিগত একচেটিয়া পুঁজির মালিকের হাতে তুলে দেওয়ার চক্রান্ত বামফ্রন্ট সরকারের অনেকদিনের। সিপিআই(এম) পরিচালিত ব্যারাকপুর পুর বোর্ড এই কাজে সামিল।

অন্যদিকে 'নোনাচন্দনপুকুর ব্যবসায়ী এবং ব্যবসা বাঁচাও কমিটি' কমিটির নেতৃত্বে এলাকার ব্যবসায়ী এবং সমস্ত গণতান্ত্রিক মানুষ গত আড়াই বছর ধরে এই তীব্র সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছেন। বিভিন্ন সময়ে এই সংগ্রামে অংশ নিয়েছেন মহাশ্বেতা দেবী সহ বিভিন্ন বুদ্ধিজীবীরা। অংশ নিয়েছেন 'একচেটিয়া আগ্রাসন বিরোধী মঞ্চ', লুমটেক্স ইঞ্জিনিয়ারিং সংগ্রামী মজদুর ইউনিয়ন প্রভৃতি সমর্থনকারী ব্যক্তি এবং সংগঠন।

পঞ্চদশ লোকসভা নির্বাচনে ব্যারাকপুর কেন্দ্রে সিপিআই(এম) সাংসদ তড়িৎবরণ তোপদারের পরাজয়ের পরও নোনাপুকুর বাজারের ব্যবসায়ীদের ভবিষ্যত এখনও বিশ বাঁও জলে। তাই সংগ্রাম জারী রাখার এবং তাকে আরও তীব্র করে গড়ে তোলার প্রস্তুতি নিচ্ছেন সংশ্লিষ্ট সকলেই।

কলকাতা টিভি

বেতনের দাবীতে বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিনিধি: বকেয়া বেতনের দাবীতে কলকাতা টিভি চ্যানেলের কর্মীরা লড়াইয়ে সামিল হয়েছেন। ২ বছর ধরে বেতন দেরীতে দেওয়া, গত ফেব্রুয়ারী মাসে ৮০ শতাংশ বেতন ও তৎপরবর্তীতে কোন বেতন না দেওয়ার বিরুদ্ধে কর্মীদের এই বিক্ষোভ।

শুরু থেকেই কলকাতা টিভি রুগ্ন অবস্থায় চলছে। এই অবস্থা কাটানোর জন্য ২০০৭-এর শেষে জৈন টিভির সাথে চ্যানেল চুক্তিবদ্ধ হলেও পরে তা ভেঙ্গে যায়। ২০০৮-এর মার্চে ভারতের অন্যতম বৃহত্তম টিভি নেটওয়ার্ক টিভি নাইন-এর সাথে টাই আপ করে কলকাতা টিভি। কিন্তু চেয়ারম্যান তথাগত দত্ত নানা অস্বচ্ছ কীর্তি করতে থাকে। চ্যানেলের ৫১শতাংশ শেয়ার টিভি নাইনের হাতে থাকলেও তাদেরকে কোনো হিসেব দেখতে দেওয়া হয়না। অথচ এবাবদ কলকাতা টিভির হাতে যে টাকা আসে তা নিয়ে চেয়ারম্যান তথাগত দত্ত ব্যক্তিগত-ভাবে দেদার খরচ করেন বলে অভিযোগ। এমনকি সুইজারল্যান্ডও ঘুরে আসেন তিনি। কর্মীদের দিয়ে নানাভাবে সই করিয়ে তিনি টিভি নাইনের কাছে চিঠি পাঠান যে কর্মীরা তাকেই চেয়ারম্যান হিসেবে চাইছে। টিভি নাইন কলকাতা টিভির সঙ্গ ত্যাগ করে।

ফেব্রুয়ারীর পর কর্মীরা আর কোন বেতন পাননি। আইপিএল-এর আগে ৫ কোটি টাকা দিয়ে সৌরভ গাঙ্গুলিকে ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসাডর করা হয়। লোকসভা নির্বাচনের সময় কর্মীরা সাধারণ সভা করে সিদ্ধান্ত নেন যে তারা কাজ করবেন না। সিদ্ধান্তের পক্ষে ১৭২ জন, বিপক্ষে ৯ জন। কিন্তু মালিকের প্রতিশ্রুতি আর অনুরোধে নির্বাচনের প্রথম দু দফা পর্যন্ত কাজ করলেও তারা তৃতীয় দফা থেকে কাজ বন্ধ করে দেন। পুরনো অনুষ্ঠান চলতে থাকে কলকাতা টিভির পর্দায়। পাওনাদারদের নোটিশে ভরে যায় অফিস। হাইকোর্ট জানায় যে কোম্পানীকে দেউলিয়া ঘোষণা করা হয়েছে।

১১ই জুন থেকে বালিগঞ্জে মালিকের বাড়ির সামনে ধর্ণা শুরু হয়। প্রতিদিন শতাধিক কর্মী সেই ধর্ণায় উপস্থিত ছিলেন। মালিক কিন্তু বিগত তিন মাস অফিসে ঢোকেনি। কখনো শোনা যায় তিনি ব্যাঙ্ককে আছেন, কখনো বা হায়দ্রাবাদে। ২২শে জুন মালিক অফিসে আসলে কর্মীরা দুপুর ১২টা থেকে শুরু করে সারা রাত তাকে ঘেরাও করে রাখেন। পুলিশ আসে। উকিলও। এবং অবশেষে মালিক লিখিতভাবে জানান যে কর্মীদের সাথে ৪৮ ঘন্টা ধরে শান্তিপূর্ণ মিটিং হয়েছে! ২৯শে জুনের মধ্যে বকেয়া মিটিয়ে দেওয়া হবে বলে তিনি প্রতিশ্রুতি দেন।

ইনফোজেনের পর অ্যাসারজেন্ট

বন্ধ হল আরও এক তথ্যপ্রযুক্তি সংস্থা

নিজস্ব প্রতিনিধি: গত কয়েক মাস ধরে আমরা এএনআই ইনফোজেন বলে একটা তথ্যপ্রযুক্তি সংস্থা অবৈধভাবে বন্ধ করে দেওয়ার কথা শুনছিলাম। সেখানকার কর্মীরা ইউনিয়ন গঠন করে পুনরায় কোম্পানী খোলার দাবীতে আন্দোলন চালাচ্ছেন। তাদের চাকরি দেওয়ার সময় প্রত্যেকের থেকে পঞ্চাশ হাজার টাকা করে নেওয়া হয়েছিল। সরকার ঐ কোম্পানীর বৈধ লাইসেন্স নেই বলে দায় এড়িয়ে যেতে চেয়েছিল। যদিও পরে আন্দোলনের চাপে মালিক গ্রেপ্তার হয়, এবং মালিকপক্ষ কোর্টে তাদের বৈধ কাগজপত্র আছে বলে দাবী করে। সরকার তবু ঠুঁটো জগন্নাথ হয়ে বসে আছে, সফটওয়্যার কর্মীদের পথে বসিয়ে।

এবার বন্ধ হল আর একটা কোম্পানী। অ্যাসারজেন্ট টেকনোলজি সলিউশনস প্রাঃ লিঃ। এখানে আবার চাকরিতে যোগ দেওয়ার সময় এক লক্ষ টাকা করে দিতে হয়েছে। এরা বিভিন্ন কলেজ থেকে ক্যাম্পাস ইন্টারভিউয়ের মাধ্যমে নিয়োগ করেছে। এবং ২০০৫ সালে প্রতিষ্ঠিত কোম্পানীটি ন্যাসকম ও সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্কের সদস্য। সারা ভারতে হায়দ্রাবাদ, ভুবনেশ্বর, দুর্গাপুর, হলদিয়া সহ বিভিন্ন জায়গায় এদের শাখা ছড়িয়ে রয়েছে, যাতে কাজ করেন প্রায় ২০০০ কর্মী। গত চার মাস ধরে তারা মাইনে পাননি। ট্রেনিদের ৬ মাসের ট্রেনিংয়ের কথা বলা হলেও ৯ মাস ধরে ট্রেনিং চালানো হয়েছে, এবং সেসময় মাত্র ২০০০ টাকা করে দেওয়া হয়েছে তাদের। কোম্পানী বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর কলকাতার সল্টলেকে ওদের অফিসে বিক্ষোভ দেখান কর্মীরা, অবরোধ করা হয় রাস্তাও। গড়ে উঠেছে অ্যাসারজেন্ট এমপ্লয়িজ সেভ কমিটি। শুধু কলকাতা নয়, ভুবনেশ্বরের কর্মীরাও যখন জানতে পারে যে কোথাও ট্রেনিদের চাকরি হচ্ছে না, তারাও আন্দোলনে ফেটে পড়েছে। একের পর এক এরকম ঘটনা, এবং অন্যান্য তথ্যপ্রযুক্তি কোম্পানীতে বেতন কমানো, প্রোমোশন আটকানোর মত ঘটনা ঘটে চলেছে।

হিন্দমোটর

শিল্পের জমিতে নগরায়ন: লড়াই চলছে

নিজস্ব প্রতিনিধি: গত ৭ই জুন হিন্দমোটর কারখানা লাগোয়া ৩১৪ একর জমিতে নগরায়ণ প্রকল্পের বিরুদ্ধে, শিল্পের জমিতে শিল্পস্থাপনের দাবীতে, এসইজেড ঘোষণার বিরুদ্ধে ও তার মধ্যেকার একশো একরের বেশী জলাজমি রক্ষা এবং পরিবেশ ও প্রাকৃতিক নিকাশী ব্যবস্থা অটুট রাখার দাবীতে সংগঠিত হল গণ অবস্থান। হিন্দমোটর কারখানার সংগ্রামী শ্রমিক কর্মচারী ইউনিয়ন (এস.এস. কে.ইউ) সহ আরো দশটি সামাজিক সংগঠনও উক্ত অবস্থানে অংশগ্রহণ করে। বিগত ২০০৬ সালে পশ্চিমবঙ্গ সরকার হিন্দমোটর কারখানা অব্যবহৃত ৩১৪ একর জমিকে বিধান সভায় আইন বদলে ১০.৫ কোটি টাকার বিনিময়ে সি. কে. বিড়লাকে ঐ জমির মালিকানা দেয়। উক্ত জমি বিড়লা মালিক রাতারাতি শ্রীরাম প্রপার্টিস নামক সংস্থাকে ২৯৫ কোটি টাকায় বেচে দেয়। সরকারের গৃহিত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ঐ টাকা হিন্দমোটর কারখানায় বিনিয়োগ ও শ্রমিক কর্মচারীদের বকেয়া মেটানোর কাজে ব্যায় করার কথা। যদিও এস.এস.কে. ইউ ২০০৬ থেকে লাগাতার শিল্পের জমিতে শিল্পের দাবীতে সোচ্চার ছিল। কিন্তু সরকার ও বিড়লা কর্তৃপক্ষ উক্ত জমিতে নগরায়ন করার জন্য নাছোরবান্দা। ঐ জমিতে প্রায় ৫৫০০ কোটি টাকা বিনিয়োগ করবে দুটি মার্কিন বহুজাতিক সংস্থা। এস.এস.কে.ইউ-র লাগাতার সংগ্রাম গত ২০০৭ সালের মার্চ মাস থেকে ৬১ দিনের ধর্মঘট অব্দি গড়ায়। সেই ধর্মঘটকে ভাঙ্গতে সক্রিয় ছিল মালিকের সাথে প্রশাসন, সি.পি.এম, এমনকি তৃণমূল কংগ্রেসও। আজকে উক্ত জমিতে কাঁচামাল সরবরাহ করছে এলাকার সি.পি.এম ও টি.এম.সি-র নানা মাপের নেতা। সেই গিল্ডের সভাপতি তৃণমূলের বিগত পঞ্চায়েত সমিতির প্রার্থী। গত ২০০৬ থেকে হিন্দমোটরের লড়াকু শ্রমিকরা উক্ত প্রকল্পের বিরোধিতায় এলাকার বিভিন্ন সামাজিক সংগঠনকে এক জোট করতে পেরেছে। চলছে এস.এস.কে.ইউ-র সামাজিক লড়াই। এদিকে মালিকরাও চুপ করে বসে নেই। তারাও এই আন্দোলনকারী শক্তিগুলোর মধ্যে ফাটল ধরানোর জন্য এস.এস. কে.ইউ-র বিরুদ্ধে নানা কুৎসা ছড়াচ্ছে। পাশাপাশি জমি বেঁচে পাওয়া ২৯৫ কোটি টাকার জোরে গত এক বছরে (জানুয়ারী ২০০৮ থেকে জানুয়ারী ২০০৯) প্রায় ২০০০ শ্রমিক কর্মচারীকে ভি.ই.আর.এস-এর নামে ছাঁটাই করেছে। ৫০ জন লড়াকু অগ্রণী এস.এস. কে.ইউ-র কর্মী ও নেতৃত্বকে মিথ্যে অপবাদে ছাঁটাই করেছে, যাতে উক্ত আন্দোলন ও কারখানাকে থেকে এস.এস. কে.ইউ-কে উৎখাত করা যায়। বিগত ২৯শে মে ঐ প্রকল্পে ছাড়পত্র দানকারী সংস্থা কে.এম.ডি.এ-র দপ্তর অভিযান করা হয়, ১০টি সংগঠনের যুক্ত মঞ্চের পক্ষ থেকে। উক্ত অভিযান ও অবস্থানে শুধু যুক্ত মঞ্চ নয়, এই আন্দোলনের পাশে সাহায্য ও সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন সংগঠন যারা নিজ নিজ ক্ষেত্রে লড়ছে। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য একচেটিয়া আগ্রাসন বিরোধী মঞ্চ, সেজ বিরোধী প্রচার মঞ্চ প্রভৃতি।

আগামী দিনে এই আন্দোলনকে তীব্রতর করার ডাক দেওয়া হয় উক্ত অবস্থান থেকে। হিন্দমোটরের শ্রমিকরা শুধু তাদের দাবী-দাওয়ার আন্দোলন নয়, তার এলাকার পরিবেশ, নিকাশী ব্যবস্থাসহ নাগরিক অধিকারের মতন সামাজিক লড়াইতেও সমানভাবে অংশগ্রহণ করছে। এবং সমাজজুড়ে সমস্ত ক্ষেত্রে মালিকদের যে আগ্রাসী নীতি তার বিরুদ্ধে লড়াই চালানোর সক্রিয় উদ্যোগে সামিল হয়েছে। তাদের আশা এই লড়াই-এ সমস্ত স্তরের মেহনতী মানুষকে তারা পাশে পাবে।

কান্দীতে মে দিবস উদযাপন

নিজস্ব প্রতিনিধি: মুর্শিদাবাদ জেলার কান্দী শহরে প্রতি বছরের মতো এবছরও মে দিবস উদ্‌যাপন কমিটির উদ্যোগে পালিত হয় ঐতিহাসিক মে দিবস। এবারে মে দিবসে দাবী ওঠে মালিক শ্রেণীর প্রতিটি হামলার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর। উল্লেখ্য মে দিবস উদ্‌যাপন কমিটি ১লা মে-র যে কেন্দ্রীয় অনুষ্ঠান তাকে ঘিরে গত ২৬শে এপ্রিল ০৯ কান্দীর জেমো ইন্দ্রতলা মোড়ে একটি প্রচারমূলক পথসভা করে। উক্ত পথসভায় 'আজকের দিনে মে দিবস পালন' এই বিষয়ের উপর প্রাসঙ্গিক বক্তব্য রাখেন আশিষ পাত্র,শ্রীকান্ত দাস। প্রাসঙ্গিক আবৃত্তি আলেখ্য করেন কোরাস নাট্যগোষ্ঠীর পক্ষ থেকে বিশ্বনাথ দে। পথসভা চলাকালীন পথচলতি মানুষের সমাগম ঘটে। উক্ত কমিটির পক্ষ থেকে ১লা মে কেন্দ্রীয় অনুষ্ঠানে যোগদানের জন্য আবেদন জানানো হয়। ১লা মে কেন্দ্রীয় অনুষ্ঠান হিসেবে একটি বর্ণাঢ্য মিছিল করা হয়। মিছিল শুরু হয় সকাল ৬.৩০ মিনিটে, কান্দী বাস স্ট্যান্ড থেকে। মিছিল শুরুর আগে পতাকা উত্তোলন করেন দোকান কর্মচারী সমিতির প্রবীণ সদস্য স্বপন মুখার্জী। মিছিল পরিক্রমা করে কান্দী শহরের মধ্য দিয়ে। মিছিল চলার পথে মাঝে হকার ঐক্যের পক্ষ থেকে হাসপাতাল রোডে পতাকা উত্তোলন করা হয় এবং রাখালিয়া নাট্যগোষ্ঠীর পক্ষ থেকে জেমোবাজারে ঐতিহাসিক মে দিবসের পতাকা তোলা হয়। মিছিলে অংশগ্রহণ করেন কান্দী শহরের পার্শ্ববর্তী গ্রামের প্রচুর মহিলা, পুরুষ ও শিশুরা। মিছিল শেষ হয় কান্দী কোর্ট চত্তরে।

কমঃ অসিত ভট্টাচার্য্যের স্মরণসভা

নিজস্ব প্রতিনিধি: গত ২রা মে '০৯, মুর্শিদাবাদের কান্দী শহরে কিছু রাজনৈতিক কর্মীদের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হল কম. অসিত ভট্টাচার্য্যের স্মরণসভা, যিনি আজীবন মেহনতি মানুষের মুক্তির জন্য সংগ্রাম করে গেছেন। উল্লেখ্য এটি তাঁর চতুর্থ মৃত্যুবার্ষিকী। সভা অনুষ্ঠিত হয় কান্দী কালিবাড়ি রোডে শ্রমিক ঐক্য সংগ্রাম কমিটির গৃহে। সভার শুরুতে কম. অসিত ভট্টাচার্য্যের ছবিতে মালা দেন মহাদেব পাল। তারপর তাঁর স্মৃতির উদ্দেশ্য এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। মর্মস্পর্শী গান পরিবেশন করেন লিপিকা সিংহ। তাঁর সম্পর্কে স্মৃতিচারণা করেন তারাশঙ্কর ভট্টাচার্য, মহাদেব পাল। অসিত ভট্টাচার্যের আজীবন রাজনৈতিক-সাংগঠনিক জীবনের ছবি তুলে ধরেন তাঁরা। আশিস পাত্র তার রাজনৈতিক জীবনের কার্যাবলীর মধ্যে দিয়ে কমঃ অসিত ভট্টাচার্য সম্পর্কে স্মৃতিচারণ করেন। সভায় প্রাসঙ্গিক দুটি কবিতা পাঠ করেন বিশ্বনাথ দে। সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন গোকুল হাজরা। এই সভায় উপস্থিত ছিলেন বিভিন্ন আন্দোলনের সাথে যুক্ত মানুষজন, সাংস্কৃতিক কর্মী ও অন্যান্যরা। কমঃ অসিত ভট্টাচার্যের কর্মনীতি, আদর্শ আগামীদিনে সমাজের বুকে হাজির করতে হবে—সভাস্থলে উপস্থিত সকলে এই বার্তা গ্রহণ করেন।

লোকসভা নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেসের ইস্তাহার

শংকর দাস

পঞ্চদশ লোকসভা নির্বাচন শেষ হয়েছে। সারা দেশে এককভাবে ২০২টি আসন জিতে নিয়ে কেন্দ্রে আগের থেকে অনেক দৃঢ়ভাবে ফিরে এসেছে কংগ্রেস। এবারে কংগ্রেসের সাথে প্রাক্ নির্বাচনী বোঝাপড়ায় তৃণমূলও এ রাজ্যে অভুতপূর্ব ভাল ফল করেছে। ১৯৭৭ সালের পর থেকে এই প্রথমবার পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্টের বিরাট পশ্চাদপসরণ ঘটেছে। এবং কংগ্রেস-তৃণমূল কংগ্রেস জোট শুধু ২৬টি আসন জিতে নিয়েছে তাই নয়, তৃণমূল কেন্দ্রের সরকারে দ্বিতীয় বৃহত্তম দল হিসাবে উঠে এসেছে। এবং প্রত্যাশিতভাবেই তারা কেন্দ্রীয় সরকারে ৬টি মন্ত্রক পেয়েছে। পাশাপাশি পশ্চিমবঙ্গের মানুষের ঘাড়ের ওপর দীর্ঘদিন ধরে চেপে বসা জগদ্দল পাথরের মতো বামফ্রন্টের শাসন এবং বিশেষ করে এই নতুন শতকে সিপিআইএম পার্টির সম্পূর্ণ রূপে একচেটিয়া পুঁজিপতিদের স্বার্থের পদতলে আত্মসমর্পণ ও তার ধাক্কায় মেহনতী মানুষের ওপর নেমে আসা তীব্র আক্রমণকে প্রতিরোধ করার জন্য জনগণের তৃণমূল কংগ্রেসকে আঁকড়ে ধরাও পরিস্থিতির এক নতুন মাত্রা তৈরি করেছে। চিন্তাশীল মানুষের এক বড় অংশও তৃণমূল কংগ্রেসকে সমর্থন করেছেন এবং তাদের স্বপক্ষে প্রচার করেছেন। স্বাভাবিকভাবেই তাই আমাদের তৃণমূল কংগ্রেসের কার্যকলাপ এবং বক্তব্য মনোযোগ সহকারে অনুধাবন করা প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। কারণ এই পোড়া দেশের নয়া ভাগ্য বিধাতাদের তালিকায় এখন তাদের নামও লেখা হয়ে গিয়েছে। এই প্রয়োজন থেকে আমরা নির্বাচনের প্রাক্কালে প্রচারিত তৃণমূল কংগ্রেসের নির্বাচনী ইস্তাহারের বিভিন্ন বক্তব্য নিয়ে ধারাবাহিক আলোচনা করব। প্রথম পর্বে আমরা আর্থিক নীতির প্রশ্নে তাদের বক্তব্য নিয়ে আলোচনা শুরু করব।

তৃণমূল কংগ্রেসের অর্থনীতি

প্রায় ৬২ পাতার এক দীর্ঘ নির্বাচনী ইস্তাহারে তৃণমূল কংগ্রেস অর্থনীতি এবং আর্থিক নীতির প্রশ্নে অনেক কথা বলেছে। তার মধ্যে কিছু কথাকে (যেমন 'উত্তরবঙ্গকে কেন এশিয়ার সুইজারল্যান্ড করা যাবে না' ইত্যাদি) যদি আমরা হিসাবের মধ্যে নাও আনি তা হলেও তাদের বেশ কিছু বক্তব্যকে আমাদের গুরুত্ব দিয়ে অনুধাবন করার প্রয়োজন। এ প্রসঙ্গে প্রথমেই আসে 'বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল আইন' বা সেজ আইনের কথা। তৃণমূল তাদের নির্বাচনী ইস্তাহারে সেজ আইনের বিরোধিতা করেছে এবং এই আইনকে 'দেশের আইন ও শ্রমনীতি বিরোধী এবং মৌলিকভাবে জনস্বার্থ বিরোধী' বলে চিহ্নিত করেছে। যদিও তৃণমূল কংগ্রেসের সাথে প্রাক্ নির্বাচনী জোট করেছে এবং কংগ্রেস পরিচালিত মন্ত্রীসভায় যোগ দিতে যাচ্ছে তথাপি নির্বাচন সাঙ্গ হওয়ার পরও তারা স্পষ্ট ভাষায় সেজ নীতির বিরোধিতা রেখেছে এবং ঘোষণা করেছে এ প্রশ্নে তাদের মনোভাব তারা কংগ্রেসকে 'বুঝিয়ে বলবে'। এখানে প্রথমেই বলে নেওয়া দরকার যে ভারতবর্ষের কেন্দ্রীয় পার্লামেন্টে যখন সেজ আইন পাশ হয় তখন তৃণমূল তার বিরোধিতা করেনি। লোকসভায় মমতা ব্যানার্জী খোদ থাকা সত্ত্বেও এবং রাজ্যসভায় তাদের একাধিক সদস্য থাকা সত্ত্বেও সেদিন সেজ আইন পার্লামেন্টে বিনা বাধায় পাশ হয়ে যায়। অন্যদিকে মজার ব্যাপার হলো এবারের নির্বাচনে তৃণমূল যে ইস্তাহার প্রকাশ করেছে সেখানে সেজ আইন প্রবর্তন করার জন্য তারা কংগ্রেস পরিচালিত পূর্বতন ইউপিএ সরকারকে একবারও দায়ী করেনি। এমনকি কংগ্রেসই যে সেজ আইন প্রবর্তন করেছিল এই কথাও তারা উল্লেখ করেনি। পরোক্ষ শব্দ ব্যবহার করে তারা লিখেছে যে— 'স্পেশাল ইকনমিক জোন বা 'সেজ' আইন গ্রহণ করা হয়েছে। যা দেশের আইন ও শ্রমনীতি বিরোধী এবং মৌলিকভাবে জনস্বার্থ বিরোধী'। কিন্তু এই আইন কে গ্রহণ করেছে এ বিষয়ে তাদের ইস্তাহার নীরব। অথচ তাদের সামনে এটা দেখানোর সুযোগ ছিল যে পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্ট সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের আগেই ২০০৩ সালে এই জনস্বার্থ বিরোধী 'সেজ' বিল নিয়ে আসে। অবশ্য এটা বললে তো এটাও বলতে হয় যে ২০০৫ সালে কেন্দ্রের কংগ্রেস সরকারও এই একই আইন গ্রহণ করেছে, যে কংগ্রেসের সাথে হাত মিলিয়ে আজ তৃণমূল নির্বাচন লড়েছে এবং নির্বাচন পরবর্তী কেন্দ্রে কংগ্রেস সরকারে যোগদান করেছে এবং মন্ত্রীত্ব নিয়েছে।

দ্বিতীয়ত, সেজ আইনকে সত্যিকারের বিরোধিতা করতে গেলে আরও কিছু জিনিসের বিরোধিতা করা একেবারেই বাধ্যতামূলক। এই বিষয়টি বুঝতে গেলে আমাদের দেশে সেজ আইন তৈরি করার কারণ বিষয়ে দু-চার কথা আলোচনা করা প্রয়োজন। আমাদের দেশে সেজ আইন তৈরি করার পেছনে যে চিন্তা কাজ করেছে তা হল এই যে, বিশ্বায়ন ভারতবর্ষের অর্থনীতির সামনে কিছু সুযোগ এনে দিয়েছে। এই সুযোগ আমাদের গ্রহণ করতে হবে এবং দেশের উন্নতি ঘটাতে হবে। কি সেই সুযোগ? সেই সুযোগ হল যে বর্তমান বিশ্বায়িত অর্থনীতিতে তীব্র প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে গিয়ে সমস্ত বড় বড় কোম্পানী তাদের উৎপাদনের ইউনিটগুলিকে আমাদের মতো দেশে স্থানান্তরিত করছে অথবা আমাদের দেশের শিল্পগুলির উৎপাদিত পণ্য নিজেদের স্ট্যাম্প মেরে (ফার্মিং আউট) বিদেশের বাজারে বিক্রি করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। কারণ আমাদের দেশে শ্রমশক্তির দাম কম এবং এখনও পর্যন্ত নাম-কা-ওয়াস্তে টিকে থাকা শ্রম আইনকে তুলে দিয়ে শ্রমশক্তির দাম আরও কমিয়ে দেওয়া সম্ভব। আর এইভাবে পণ্য এবং পরিষেবার উৎপাদন মূল্য কমিয়ে প্রতিযোগিতার বাজারে তারা টিকে যাবে বলে তাদের ধারণা। এই পরিস্থিতিকে আমাদের সামনে নয়া সুযোগ বলে বর্ণনা করা হল এবং সেজ আইন প্রবর্তন করা হলো। যে সেজ আইন শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরী থেকে শুরু করে চাকরির গ্যারান্টি এবং অন্যান্য সুযোগ সুবিধা সম্পূর্ণ হরণ করে তাদের এক মধ্যযুগীয় শোষণের যাঁতাকলে নিষ্পেষিত করার রাস্তা তৈরি করল। সুতরাং একথা খুবই স্পষ্ট যে বিশ্বায়ন আমাদের দেশের শ্রমের সামনে কোন সুযোগ বা সম্ভাবনা তৈরি করেনি। সুযোগ বা সম্ভাবনা যা তৈরি হয়েছে তা হল বিশ্বায়িত একচেটিয়া আগ্রাসী পুঁজির সামনে। ভারতীয় পুঁজি যার অংশীদার। মজার ব্যাপার হল তৃণমূল কংগ্রেসও তাদের ইস্তাহারে আমাদের সামনে এই সুযোগ বা সম্ভাবনার কথাই বিবৃত করেছে।

নির্বাচনী ইস্তাহারে তৃণমূল কংগ্রেস লিখেছে— 'একদিকে রাজ্যের ভয়াবহ সর্বাঙ্গীন সংকট ও অন্যদিকে বিশ্বায়নের ফলে সৃষ্ট উন্নয়নের সমস্যা ও সম্ভাবনা, এই দুইয়ের প্রেক্ষিতে রাজ্যের পুনর্গঠনের কাজে তৃণমূল কংগ্রেসের দৃষ্টিভঙ্গী ও অবস্থান সুনির্দিষ্ট ও সুস্পষ্ট'। অর্থাৎ বিশ্বায়নের ফলে উন্নয়ন সংক্রান্ত সমস্যা যেমন কিছু আছে তেমনি আছে সম্ভাবনাও। আর সেই সম্ভাবনাকে প্রকৃত অর্থে ব্যবহার করতে গেলে দরকার 'সুনির্দিষ্ট এবং সুস্পষ্ট' দৃষ্টিভঙ্গী। যা তৃণমূল কংগ্রেসের আছে। কিন্তু কি সেই 'সুনির্দিষ্ট এবং সুস্পষ্ট দৃষ্টিভঙ্গী?' আসুন তাদের মুখ থেকেই শোনা যাক। উপরে উদ্ধৃত আইনটির পর ইস্তাহারে লেখা হয়েছে— 'বিভ্রান্ত, নীতিহীন ষষ্ঠ বামফ্রন্ট সরকার কোনও মতে বিশ্বায়নের এক চট-জলদি ব্যাখ্যাকে আঁকড়ে ধরে শুধুই বিশ্বপুঁজি আর বিশ্বায়নের ভোগ্যবস্তুকে দোরগোড়ায় এনে ফেলাকেই পরম কর্তব্য ঠাউরেছে। তৃণমূল কংগ্রেস মনে করে বিশ্বকে দোরগোড়ায় ডেকে আনা যেমন প্রয়োজন তেমনই আরও জরুরী স্থানীয় সম্পদ ও দক্ষতাকে সম্বল করে স্থানীয় অর্থব্যবস্থাকে মজবুত বুনিয়াদে প্রতিষ্ঠা করে প্রয়োজনমতো বিশ্বের দোরগোড়ায় যাওয়া। এই কাজটি সুসম্পন্ন হলে উদ্বাস্তু হয়ে থাকতে হয় না, বিশ্ব আপনি আসে দোরগোড়ায়। স্থানীয়করনের এই প্রয়োজনীয়তাকে বিশ্বায়নের প্রবক্তা বিশ্বব্যাংকও অস্বীকার করেনি (ওয়ার্ল্ড ডেভেলপমেন্ট রিপোর্ট, ২০০৩)। এই প্রয়োজনীয়তা শুধু অজানা থেকে গেছে রাজ্যের ষষ্ঠ বামফ্রন্ট সরকার ও তার মুখ্যমন্ত্রীর কাছে। মুখ্যমন্ত্রী তাই স্থানীয় অর্থব্যবস্থা নয়, ব্যস্ত হয়েছেন কী করে জাপানি শিল্পপতিদের মন পেতে তাদের মনোরঞ্জনে সুন্দরবন অঞ্চলে আস্ত একটি দ্বীপ উপহার দেবেন— 'আসুন, আপনারা গলফ খেলুন'।''— এই দীর্ঘ উদ্ধৃতিটি পাঠককে একটু মনোযোগ সহকারে খেয়াল করুন। ষষ্ঠ বামফ্রন্ট সরকার বিভ্রান্ত এবং নীতিহীন কারণ তারা বিশ্বায়নের এক চটজলদি ব্যাখ্যাকে আঁকড়ে ধরেছেন। কিন্তু তৃণমূল কংগ্রেস বিশ্বায়নের এক সুচিন্তিত এবং সুদরপ্রসারী ব্যাখ্যার প্রবক্তা। যেখানে বামফ্রন্ট 'স্থানীয় অর্থব্যবস্থাকে' মজবুত করেনি যেখানে তৃণমূল তাই করতে চায়। কিন্তু স্থানীয় অর্থনীতিকে তৃণমূল মজবুত করতে চায় কেন? কারণ তারা পরিষ্কার করেই বলেছে। বিশ্বকে নিজের দোরগোড়ায় এনে ফেলার জন্য।

অর্থাৎ সুকৌশলে বিশ্ব পুঁজিকে আহ্বান জানানো হয়েছে এবং বলা হয়েছে যে বামফ্রন্ট যে কাজটি ঠিক করে উঠতে পারেনি অর্থাৎ অভ্যন্তরীন পরিকাঠামোসহ 'স্থানীয় অর্থব্যবস্থা'কে মজবুত করে বিশ্ব পুঁজির সেবায় লাগানো— তা অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে তৃণমূল কংগ্রেস করবে। তাদের এই মনোভাবের সঙ্গে সিঙ্গুরে টাটাদের জমি না দিয়ে গ্লোবাল টেন্ডার ডাকার দাবী একেবারেই মিলে যায়। এমনকি নির্বাচনী ইস্তাহারেও তারা লিখেছে যে— ''সিঙ্গুরের অনিচ্ছুক কৃষকদের ৪০০ একর জমি ফেরৎ দিয়ে অধিকৃত ৬০০ একর জমিতে বিশ্ব বরাতের ভিত্তিতে শিল্প চাই''। বক্তব্য পরিষ্কার!

আরও খেয়াল করুন। বিশ্বায়িত পুঁজির স্বার্থের দিকে তাকিয়ে স্থানীয় অর্থনীতিকে গড়ে তোলার কৌশল, যার উদ্ভাবক হল তৃণমূলের ভাষাতেই— 'বিশ্বায়নের প্রবক্তা বিশ্বব্যাঙ্ক', তা নতমস্তকে তৃণমূল কংগ্রেস গ্রহণ করেছে। এবং বামফ্রন্ট সরকারকে এই বলে দোষারোপ করেছে যে তারা বিশ্বব্যাংকের এই নির্দেশটা ভাল করে জানেই না। বুঝুন কাণ্ড!

আমরা জানি যে যারা বিশ্ব জুড়েই বিশ্বায়িত আগ্রাসী একচেটিয়া পুঁজি তার নিজের স্বার্থে সমস্ত স্থানীয় অর্থনীতিকে নিজের মতো করে গড়ে পিটে নিতে চাইছে। আইএমএফ বা ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের মতো সাম্রাজ্যবাদী প্রতিষ্ঠানগুলির তত্ত্ববিদরা এই লক্ষ্যে এশিয়া, আফ্রিকা, লাতিন আমেরিকার সমস্ত দেশের সরকারকে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে পরামর্শ দিয়েছেন। বিশ্বপুঁজির অবাধ চলাচল এবং অবাধ লুণ্ঠনের স্বার্থে স্থানীয়করনের এই তত্ত্ব যা গ্লোবালাইজেশন্ নামে পরিচিত তা ইতিমধ্যেই আমাদের দেশে মনমোহন সিং, বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য, নিরুপম সেন-রা গ্রহণ করেছেন এবং সেই অনুযায়ী কাজ করছেন। কৃষকদের কাছ থেকে জমি কেড়ে নিয়ে পুঁজিপতিদের হাতে তুলে দেওয়া, দেশের কৃষি ব্যবস্থাকে ম্যাকিনসের মতো সংস্থার পরামর্শ মতো সাম্রাজ্যবাদী শৃঙ্খলে যুক্ত করা, সেজ আইনের মধ্য দিয়ে শ্রমিকদের ন্যূনতম অধিকারটুকুও হরণ করে— ইচ্ছামত মজুরী দিয়ে, ইচ্ছামত নিয়োগ এবং ছাঁটাই করার ক্ষমতা বজায় রেখে মধ্যযুগীয় শোষণ বজায় রাখা সেই কর্মপদ্ধতিরই অঙ্গ। এখন এই রঙ্গমঞ্চে নতুন খিলাড়ীর আবির্ভাব হলো— তৃণমূল কংগ্রেস, যারা নিজেদের এই খেলায় আরও দক্ষ বলে বিজ্ঞাপিত করতে শুরু করেছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে যে শালবনীতে জিন্দালদের 'সেজ' প্রকল্পকে কিন্তু তৃণমূল বিরোধিতা করেনি, এই যুক্তিতে যে সেখানে কৃষকরা 'স্বেচ্ছায়' জমি দিয়েছে! এই তৃণমূল নাকি নীতিগতভাবে 'সেজ' স্থাপনের বিরোধী! তাহলে কি করতে চায় তৃণমূল! মানুষকে 'বুঝিয়ে' তাদের রাজী করাবে 'স্বেচ্ছায়' শাসকশ্রেণীর এই তীব্র আক্রমণকে মেনে নিতে? বামফ্রন্ট এই কাজটাই পিটিয়ে করছিল শুধু এই কি ছিল অপরাধ? সুতরাং বিভ্রান্ত, নীতিহীন এবং অপদার্থ বামফ্রন্ট যা করতে পারেনি তা দক্ষতার সাথে করবে তৃণমূল এবং 'উদ্বাস্তু হয়ে বিশ্বকে ডাকা'-র পরিবর্তে যারা 'প্রয়োজনমত বিশ্বের দোরগোড়ায় যাবে' এবং ঘোষণা করবে— 'আসুন, আপনারা গলফ খেলুন এবং স্বেচ্ছায় রাজী হওয়া জনতাকে ইচ্ছামত শোষণ করুন'!

সুতরাং এ কথা খুবই স্পষ্ট যে সেজ আইনকে শুধু মৌখিক স্তরে নয়, কার্যক্ষেত্রে সর্বান্তঃকরণে বিরোধিতা করতে গেলে বিশ্বায়নকে এবং বিশ্বায়িত পুঁজিবাদী অর্থনীতিকে চরম বিরোধিতা করতে হবে এবং বিশ্বায়িত পুঁজির জাল কেটে বেরিয়ে আসার রণনীতি নির্ধারণ করতে হবে। হয় বিশ্বায়িত পুঁজির সেবাদাসত্ব করতে হবে নয় তাকে উচ্ছেদ করার লক্ষ্যে মরণপণ সংগ্রাম করতে হবে। এর কোনো মাঝামাঝি নেই।

দুর্ভাগ্যজনকভাবে তৃণমূল কংগ্রেস কিন্তু এই প্রশ্নে জনগণকে বিভ্রান্ত করার রাস্তা নিয়েছে এবং ঠিক সিপিএমের মতোই দ্বিচারিতার রাস্তা গ্রহণ করেছে। তাদের দ্বিচারিতার নমুনা দেখুন! ইস্তাহারের শুরুতে বলা হয়েছে— '১৯৯১ সাল থেকে সব কেন্দ্রীয় সরকারই বিশ্বায়ন, উদারীকরণ ও বেসরকারিকরনের নীতি নিয়ে চলেছেন। তাতে দেশের বিপুল সংখ্যক শ্রমিক ও কৃষকশ্রেণির স্বার্থ উপেক্ষিত হয়েছে।' এখানে কায়দা করে 'উপেক্ষিত হয়েছে'— এই শব্দবন্ধ ব্যবহার করা হয়েছে। চেপে যাওয়া হয়েছে এই সত্য যে, বিশ্বায়ন, উদারীকরণ, বেসরকারিকরণের নীতি নিয়ে চললে শ্রমিক-কৃষক সহ ব্যাপক মেহনতী মানুষের স্বার্থকে উপেক্ষা করা এবং জলাঞ্জলি দেওয়া ছাড়া অন্য কোন উপায় থাকে না। নিজেদের স্বার্থে শ্রমিক-কৃষক যখন সংগ্রামে অবতীর্ণ হন তখন সেই সংগ্রামকে দমন করা ছাড়া (যেমন হয়েছে সিঙ্গুর-নন্দীগ্রামে, উড়িষ্যার কলিঙ্গনগরে, পস্কো বিরোধী সংগ্রামে অথবা মহারাষ্ট্রে বা উত্তর প্রদেশে) অন্য উপায় থাকে না। পুঁজির স্বার্থ আর শ্রমের স্বার্থ একইসাথে রক্ষা করার কথা হয় অজ্ঞতা নয় ভাঁওতাবাজী। আবার তার পরের বাক্যে বলা হয়েছে— 'আমরা বিশ্বায়নের বিরুদ্ধে নই। যদি তা গরিব মানুষের কাজে লাগে'। ভাবখানা এইরকম যে বিশ্বায়ন ব্যাপারটা কী তা তো আমরা ঠিকমতো জানি না। যদি গরিব মানুষ উপকৃত হয় তা হলে আমরা তার সমর্থক। যদি গরিব মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হন তাহলে আমরা বিরোধী। অথচ একটু আগে আমরা দেখলাম যে ইস্তাহারের অন্যত্র তারা বলছেন যে বিশ্বায়ন ব্যাপারটা ভালভাবে তারাই বোঝেন, বিশ্বব্যাংকের নির্দেশ তারাই সফলভাবে মেনে চলার উপযুক্ত। অপদার্থ বামফ্রন্ট বিশ্বায়নের সম্ভাবনাটাই ঠিক বুঝতে পারেনি!

এই লুকোচুরি, এই কথার মারপ্যাঁচ, এই দ্বিচারিতা কেন? তৃণমূল কংগ্রেস এই সবের সাহায্যে কী লুকোতে চাইছেন? তাদের প্রকৃত শ্রেণীচরিত্র, প্রকৃত উদ্দেশ্য নিয়েই। তাদের ইস্তাহার নিয়ে আমাদের আলোচনা যতই এগোবে ততই এই প্রশ্নের জবাব আমাদের কাছে পরিষ্কার হয়ে উঠবে।

এস ই জেড বিরোধী লড়াই

পস্কোর কাজ শুরু হতে দেরী হবে: উড়িষ্যা সরকার

পারাদ্বীপ অঞ্চলে স্থানীয় অধিবাসীদের প্রতিরোধ সাউথ কোরিয়ান স্টীল কোম্পানী পস্কো'র ভারতবর্ষে কারখানা স্থপন আপাততভাবে একটা ধাক্কা দিতে সমর্থ হয়েছে। কোম্পানীটি উড়িষ্যা রাজ্যসরকারের সাথে ২০০৫ সালে একটি মউ স্বাক্ষর করে একান্ন হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগে বার্ষিক ১২ মেগাটন স্টীল উৎপাদনের এর জন্য। প্রয়োজনীয় ৪০০৪ একর জমি রাজ্য সরকার পারাদ্বীপের কাছে দিতে প্রস্তুত হয়। যার মধ্যে ৪৩৭.৬৬ একর ব্যক্তিগত সম্পত্তি, ২৯৫৮.৭৯ একর জঙ্গল এবং জঙ্গলহীন জমি ৬০৭.৭৪ একর। রাজ্যের স্টীল এবং খনি মন্ত্রী রঘুনাথ মোহান্তি বলেছেন বর্তমান যা পরিস্থিতি তাতে পস্কো প্রজেক্ট বিলম্বিত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। প্রজেক্টটিতে ২০১০ সালে প্রথম দফার কাজ শুরু হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু স্থানীয় বাসিন্দাদের গণআন্দোলনের সম্মুখীন হওয়ায়, প্রথমে জঙ্গল এবং পরিবেশ মন্ত্রকের ছাড়পত্র পেলেও, কোম্পানীর এবং সরকারী তরফের কেউই প্রস্তাবিত প্ল্যান্টের জায়গায় ঢুকতে পারেনি।

রায়গড়ে জমি অধিগ্রহণ এখন স্থগিত: সুপ্রীম কোর্ট

মুকেশ আম্বানীর স্বপ্ন— মহারাষ্ট্রে রিলায়েন্সের সবচেয়ে বড় এস. ই. জেড. তৈরীতে আপাতত ইতি টেনে দিল সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি বি. সুদর্শন রেড্ডীর ডিভিশন বেঞ্চ। গ্রামবাসীদের প্রতিরোধের সামনে, রিলায়েন্সের তিন বছরের চেষ্টা এবং ৬০০ কোটি টাকা খরচের পরেও প্রস্তাবিত ১০,০০০ হেক্টর জমির খুব সামান্য অংশই রিলায়েন্স অধিগ্রহন করতে পেরেছে। রায়গড়ের অর্ধেকের বেশী গ্রাম গত বছর এই প্রজেক্টের বিরুদ্ধে ভোট দিয়েছিল। সুপ্রিম কোর্ট রিলায়েন্সের এই জমি অধিগ্রহন প্রক্রিয়াকে স্থগিত রাখার আদেশ দিয়েছে। অন্যদিকে এই আন্দোলনের অন্যতম সংগঠক সুপ্রীম কোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি পি বি সাওয়ান্ত-এর আহ্বানে এক সর্বভারতীয় সেজবিরোধী মঞ্চ গড়ে তোলার উদ্যোগ চলছে। মহারাষ্ট্রে আগামী ৫ মাসের মধ্যে বিধানসভা নির্বাচন, তাই রাজ্য সরকারও বিষয়টা নিয়ে বেশী ঘাঁটাতে নারাজ। গত তিন বছরে ৫৬০ টিরও বেশী এস. ই. জেড. বানাবার ছাড়পত্র দিয়েছে কেন্দ্র সরকার। কিন্তু একেরপর এক প্রতিরোধ দেখিয়ে দিচ্ছে বড় শিল্পপতির মুনাফার জন্য জমি অধিগ্রহন খুব সহজেই জনগনের কাছ থেকেপার পাবে না।

মুল্যবৃদ্ধি উদ্বেগজনক: রিজার্ভ ব্যাঙ্ক প্রধান

আর.বি.আই চিফ ডঃ সুব্বারাও দেশের তেল এবং খাদ্যশস্যের মূল্যবৃদ্ধির ঘটনায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। তিনি এও বলেছেন যদিও দেশের গড় মূল্যবৃদ্ধির সূচক ঋণাত্বক তবুও তেল এবং সাধারণ জিনিসপত্রের মূল্য সারা বিশ্বজুড়েই বৃদ্ধি পাচ্ছে। এর সাথে খাদ্যদ্রব্যের উৎপাদনের হারও প্রয়োজনের তুলনায় কম। তাই ভারতের মত দেশে তেল এবং সাধারণ জিনিসপত্রের দাম নিয়ন্ত্রনে রাখাটাই আশু কর্তব্য। দেশ মন্দার কবলে পড়বে না সে ব্যাপারে তিনি আশ্বাস দিয়েছেন। কিন্তু এটা স্পষ্ট যে, বেতন হ্রাস, কর্মচ্যুতি সহ মন্দার নানা লক্ষণ এখানেও প্রকট। মূল্যবৃদ্ধি যেন এখানে মড়ার ওপর খাঁড়ার ঘা।

প্রসঙ্গ—সিপিএমের নির্বাচন পরবর্তী আত্মসমীক্ষা

১ পৃষ্ঠার শেষাংশ

ja HC BcmiQejJ EcW Hm ®k hÙhih fdiej¿¢ q®he ¢L eiz ¢L¿¹ hiÙ¹ch ®cMi ®Nm "f¢Rcu fsi' f¡h¡mL HC "fÑNan£m' ®SiVcL ®eca f¡lm eiz

®ai, A¿¢ai ftÔQjhr্গl ®rত্রে HC "LwcNp qiJuicLC fdie L¡lZ ¢qpch dcl ®eJuiVi h¡ml j¡dÉ jM ও্ত EVf¡tMhiš ¢Lei, ®pC L®We fn Bf¡aai HM¡ce Ll¡ প্রয়োজন HC jqca Bj¡ccl fnV¡ HLV AeÉlLjz fnV¡ qm, kic dl¡ kiL ¢p ¢f Hj ®eaa hTca f¡lcae ®k qiJuj LwcNpl ¢ccLC, aiqcm ai¡ ¢L Llcae? fljiZ Q¢š²l pju ®bcL LwcNpl pi¢b ®k ta¢š²aj

সমর্থন প্রত্যাহারের আগের কথা

সাম্রাজ্যবাদ ও সাম্প্রদায়িকতা

লাইনের বদল, কিন্তু কেন?

পশ্চিমবঙ্গ

খুচরো এবং পাইকারী ব্যবসায় বৃহৎ পুঁজি

মেট্রো মডেল

সুশান্ত বোস

এ যেন কিংকং সিনেমার দৃশ্য। এক বিশালাকার দৈত্য ধীর পদে শহরের দিকে এগিয়ে আসছে। আর লিলিপুটের মত মানুষগুলো ভয়ে এবং আতঙ্কে চারিদিকে ছোটাছুটি করছে। সারা শহরে ত্রাহি ত্রাহি রব পড়ে গেছে। আমাদের এই শহরেও এক দৈত্য এসেছে। তবে একোনো জান্তব দৈত্য নয়, এ হল জার্মান বহুজাতিক দৈত্য, নাম "মেট্রো ক্যাশ এন্ড ক্যারি", বিশ্বের পঞ্চম বৃহত্তম বিপনি সংস্থা। ই এম বাইপাসের ধারে সাড়ে সাত একর জমির উপর তৈরী বিশাল এবং বিলাসবহুল এই পাইকারী সরবরাহ কেন্দ্র থেকে তারা চলতি বাজার দর থেকে ২০-৩০% কম দামে চাল, ডাল, নুন, তেল, সাবান, শ্যাম্পু, মোবাইল ফোন, ডিভিডি প্লেয়ার সহ প্রায় আঠারো হাজার এর উপর জিনিস বিক্রী করবে। আর কারা কিনবে? কিনবে পাইকারী ব্যবসাদার, বিভিন্ন হোটেল, রেস্তোরা, ক্যাটারার, হাসপাতাল, খুচরো বিক্রেতা সহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান যাদের ব্যবসায়িক লাইসেন্স আছে। তাহলে কারা এই দৈত্যের পায়ের তলায় চাপা পড়ছে?

ওয়েস্ট বেঙ্গল ডিস্টিবিউটার্স অ্যাসোসিয়েশন এর সম্পাদক সঞ্জয় কর্মকারের বক্তব্যে আমরা এই প্রশ্নের উত্তর পাব। পাইকারী এবং খুচরো দোকানদাররা কখনই চাষীর থেকে অথবা অন্য উৎপাদনকারীর থেকে সরাসরি মাল কেনেন না। কারন তাদের সেই সামর্থ নেই। এঁরা নির্ভর করেন পরিবেশক অথবা জোগানদারদের উপর। মেট্রো পন্য কিনবে সরাসরি। অর্থৎ বিক্রেতা আর পন্য উৎপাদক সংস্থার মাঝে জোগানদারদের আর প্রয়োজন থাকছে না। অর্থাৎ কয়েক লক্ষ মানুষ বেকার। যারা প্রতিদিন পন্য সরবরাহ করে ঘরে দু'পয়সা আনতেন, বাড়ীর কচিকচি মুখগুলোতে হাসির ঝলক দেখতেন, তারা আর কোথায় পন্য সরবরাহ করবেন? আরো দেখুন খুচরো আর পাইকারী দোকানদাররা পন্যসরবরাহকারী ডিলার বা পরিবেশক ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে ধারে মাল কেনার যে সুযোগ পাচ্ছেন, মেট্রোর প্রবেশে সে সুযোগ আর থাকছে না। কারন, মেট্রোর শর্তই হচ্ছে ক্যাশ এন্ড ক্যারি, পয়সা দাও জিনিস নাও। বিনিময়ে তারা দিচ্ছে লোভনীয় ছাড়ের সুযোগ, যা মেট্রো আদায় করছে উৎপাদনকারী অথবা চাষীদের কাছ থেকে সরাসরি পন্য কিনে। উৎপাদক সংস্থাও দেখছে তাদের একটা বড় রকমের খরচ বহন করতে হয় সেলস টীম এবং ট্রান্সপোর্টের জন্য। তার আর প্রয়োজন হচ্ছে না। অর্থাৎ আবার বেশ কয়েক হাজার মানুষের কর্মচ্যুতি। প্রথম প্রথম নগদ অর্থের বিনিময়ে মেট্রোর কাছ থেকে পন্য কিনতে কিনতে একসময় ছোট ব্যবসায়ীদের পুঁজিতেও টান ধরবে এবং তাঁরা বাধ্য হবেন দোকান বন্ধ করে দিতে। কারন ততদিনে ছোট দোকানদারদের বুকের উপরই জগদ্দল পাথরের মত চেপে বসবে টাটা, বিড়লা, ওয়ালমার্ট, আম্বানি, টেস্কোর মত দেশী বিদেশী ধনকুবেররা (দৈত্য) তাদের ঝাঁ চকচকে খুচরো ব্যবসার মল নিয়ে।

কিন্তু মেহনতি মানুষের সরকার বলে দাবী করা বাম সরকারের এদিকে কোনো ভ্রূক্ষেপ নেই। বরং পুঁজিবাদি উন্নয়নের রঙিন চশমাধারী এই সরকার উন্নয়নের নামে এক ভয়ঙ্কর রাক্ষুসে সমাজব্যবস্থাকে এরাজ্যে কায়েম করতে চলেছেন, যে সমাজব্যবস্থা অনায়াসে গিলে নেবে সমাজের খেটে খাওয়া লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবন ও জীবিকা। এই সরকার কী করেছে? তারা মেট্রোকে কলকাতায় ব্যবসার অনুমতি দিয়েছে, বাইপাসের ধারে নথিভুক্ত জলাজমিতে বিপণনকেন্দ্র নির্মানের ছাড়পত্র দিয়েছে। এই মেট্রো এসেছে ১০০% বিদেশী বিনিয়োগ নিয়ে। এই সিপিএম-ই আবার গত বছর দিল্লীতে ওয়ালমার্টকে কেন ব্যবসা করতে দেওয়া হচ্ছে তা নিয়ে বিক্ষোভের তামাশা করেছে। মেট্রো

কলকাতায় মেট্রো ক্যাশ অ্যান্ড ক্যারীর উদ্বোধন

যাতে ব্যবসার লাইসেন্স পায় সেজন্য সিপিএম এর রাজ্য কমিটির সদস্য এবং সুন্দরবন উন্নয়ন মন্ত্রী কান্তি গাঙ্গুলী কৃষিমন্ত্রী নরেণ দে কে 'অনুরোধ' জানিয়েছেন। ফরওয়ার্ড ব্লকের অধীন রাজ্য কৃষি বিপনন পর্ষদ মেট্রোকে এরাজ্যে পাইকারী ব্যবসার অনুমতি দিতে রাজি ছিল না। তাদের ক্রমাগত বাধাদানে ক্ষুব্ধ হয়ে কলকাতায় জার্মান কনসাল জেনারেল গুন্টার ভেরমান সরাসরি রাজ্য সরকারকে হুমকি দেন," লাইসেন্স না পেয়ে মেট্রোকে এরাজ্য থেকে চলে যেতে হলে এদেশে পূর্বাঞ্চলে আর কোনো জার্মান লগ্নি আসবে না।" এ কি ভয়ানক কথা? রঙিন চশমার রং যে ফিকে হয়ে আসছে। না

প্রতিবাদ: কলকাতায়('০৮), ব্যাঙ্গালোরে('০৩)

এতো হতে দেওয়া যায় না। পরদিনই রাজ্যের মূখ্যমন্ত্রী কৃষিমন্ত্রীর সাথে কোনো আলোচনা ছাড়াই দক্ষিন চব্বিশ পরগনার জেলাশাসকের কাছে নির্দেশ পাঠান - এমাসের মধ্যেই মেট্রোর লাইসেন্স মঞ্জুর বা পুনর্নবীকরন করতে হবে (২৬-০৯)। তারপরেই বেশ কিছু শর্তসাপেক্ষে মেট্রোকে ব্যবসার ছাড়পত্র দেয় পর্ষদ।

কিন্তু শুধু শিকল পড়িয়ে কি বিশালাকার দৈত্যকে বেধে রাখা যায়? সরকার জানে তা যায় না, সিপিএম পলিটব্যুরো বলেছে "ওয়ালমার্ট, টেসকো, কেয়ারফরের মত দৈত্যাকার বহুজাতিক সংস্থা পা বাড়ালেই যে শুধু সংগঠিত খুচরো ব্যবসা তুঙ্গে উঠবে তাই নয়, এদের অনুপ্রবেশের ফলে সরকার ছোটো ব্যবসায়ী বা কৃষকদের স্বার্থরক্ষার প্রয়োজনে যে উদ্যোগই নিক না কেন এরা তাতে অন্তর্ঘাত ঘটাবে।" দেখুন কান্ড, সিপিএম নিজেই বলছে যে বৃহৎ পুঁজিকে একবার এ দেশের বাজারে ঢোকবার সুযোগ করে দিলে তাদের উপর নিয়ন্ত্রন আরোপ করে কোনো কাজ হবে না। যে ভুল করলে রাজ্যের এক বিপুল অংশের মানুষের জীবন বিপন্ন হবে, বাস্তেব মেট্রোকে এ রাজ্যে ডেকে এনে তারা সেটাই করেছে। তাদের দ্বিচারিতার আরো নমুনা দেখুন। বাম সরকার খুচরো ব্যবসায় বৃহৎ পুঁজির অনুপ্রবেশের বিরোধীতা করলেও নিয়িন্ত্রত আকারের পুঁজির অনুপ্রবেশে তাদের কোনো আপত্তি নেই। সিপিএম পলিটব্যুরো এক প্রস্তাবে বলেছে, "সংগঠিত খুচরো ব্যবসাকে এমনভাবে বেড়ে উঠতে দেওয়া যাবে না, যার ফলে অসংগঠিত খুচরো ব্যবসায়ীদের উচ্ছেদ ঘটবে এবং লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবনে জীবিকাচ্যুতি ও কর্মহীনতা নেমে আসবে।" অর্থাৎ তাদের বক্তব্য দেশী-বিদেশী বড় পুঁজি আসুক, কিন্তু তাতে যেন অসংগঠিত খুচরো ব্যবসায়ীদের কোনো ক্ষতি না হয়। বুদ্ধবাবুরা হয়তো মার্কসবাদ ভুলে গেছেন বা তাকে অস্বীকার করতে চাইছেন। একই ব্যবসায় বড় পুঁজি ছোটো পুঁজিকে উৎখাত করবে না এ তো সোনার পাথরবাটি। কলকাতায় মেট্রো কমবেশী পৌনে দুশো কোটি টাকা বিনিয়োগ করেছে। সুতরাং তারা যে দামে জিনিস বিক্রি করবে, স্থানীয় পাইকারা সে দামে জিনিস বিক্রি করতে পারবে না কারণ তাদের পুঁজি অনেক কম। সুতরাং, এটা সহজেই বোঝা যায় যে পাইকারী ব্যবসায়ীদের বিক্রি কমবে এবং একসময় তাদের ব্যবসা পুরোপুরি বন্ধ হয়ে যাবে। আসলে একদিকে শ্রমজীবি মানুষের পাশে থাকার কথা বলছেন এবং আরেকদিকে তারা বড় বড় পুঁজিপতিদের রাজ্যে ডেকে এনে গরীব মানুষদের ভাতে মারার ব্যবস্থা করছেন। আর মেট্রো এলে পাইকারী এবং খুচরো ব্যবসায়ীরা যে ক্ষতিগ্রস্ত হবেন তার উদাহরণ এদেশেই আছে। ব্যাঙ্গালোর (এই শহরেই মেট্রো তাদের প্রথম ব্যবসা শুরু করে, ২০০৩ এ) এবং হায়দ্রাবাদে মেট্রো তাদের ব্যবসা শুরু করার পর এদুটি শহরের পাইকারী এবং খুচরো ব্যবসায়ীদের ব্যবসা আগের তুলনায় অনেক কমে গেছে। ব্যাঙ্গালোরে ব্যবসায়ীরা একজোট হয়ে মেট্রোর বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করে।

তাদের সংগঠন ব্যাঙ্গালোর ট্রেডার্স অ্যাকশন কমিটির (BTAC) সভাপতি রমেশ চন্দ্র লাহোতি জানান, যেখানে প্রতিদিন ২০ কোটির ব্যবসা হতো, সেখানে তা প্রায় বন্ধ হওয়ার জোগাড়। প্রতিবার দেওয়ালির সময় এ অঞ্চলের ব্যবসা অন্যান্য সময়ের তুলনায় প্রায় দ্বিগুন হ'তো, সেখানে এবার তা হয়নি। এছাড়া প্রচুর লোক তাদের কাজ হারিয়েছে। এই এলাকায় প্রায় সাড়ে সাত হাজার লোক কাজ করে। সেখানে মেট্রোতে মাত্র সাড়ে সাতশো জনের কাজের সংস্থান হয়। সেক্ষেত্রে বাকীদের কি হবে? এছাড়া অনেক ক্রেতাই মেট্রো থেকে জিনিস কেনে, কিন্তু তা তাদের ব্যবসার জন্য নয়। আসলে মেট্রো এখন তাদের ব্যবসাকে বি টু বি (বিজনেস্ টু বিজনেস্) ফর্ম থেকে বি টু সি (বিজনেস্ টু কনজিউমার) ফর্মে পাল্টে নিচ্ছে। মি. লাহোতির নেতৃত্বে প্রায় এক হাজার ব্যবসায়ী রাজ্যের কৃষি বিপনন মন্ত্রীর হস্তক্ষেপ দাবী করেছেন, হাইকোর্টে তারা মেট্রোর বিরুদ্ধে চুক্তিভঙ্গের মামলা দায়ের করেছেন। এ রাজ্যেও "একচেটিয়া আগ্রাসন বিরোধী মঞ্চ" নামে সংগঠন তৈরী হয়েছে, যারা খুচরো ব্যবসায় বহুজাতিক পুঁজির অনুপ্রবেশের বিরুদ্ধে সর্বত্র প্রতিবাদ আন্দোলন সংগঠিত করছে।

জোট বাঁধো, তৈরী হও

১ পৃষ্ঠার শেষাংশ

'কংগ্রেসী হাওয়া', 'সোনিয়া-মনমোহন-রাহুলের' বিচক্ষণতার কথা বলে বৃহৎ সংবাদপত্র-গুলি একধরনের মিথ্যাচার করছে। পঞ্চদশ লোকসভা নির্বাচনের পর একথা আমরা বলতে পারি বিশ্বায়নী যে নীতিকে বিগত বছরগুলিতে কংগ্রেস পরিচালিত সরকার বাস্তবায়িত করেছে, আগামীদিনে তা আরো বড় রূপ নেবে। 'উদার' আর্থিক নীতির নীতিগুলোকে বাস্তবায়িত করার জন্য দেশের কোটি কোটি গরীব মানুষের উপর আক্রমণ আরো বেশী করে নামবে।

এবার আসা যাক পশ্চিমবঙ্গের অবস্থার দিকে। পশ্চিমবাংলার সি পি আই(এম) দলের নেতৃত্বাধীন বামফ্রন্ট সরকার কার্যত বিপর্যস্ত। ২০০৪ সালে লোকসভা নির্বাচনে এরাজ্যে বামপন্থীরা পেয়েছিল ৩৫ টা আসন। এবারে ২০ টা সিট কমে হয়েছে ১৫ টি। ভোট কমেছে প্রায় ৭ শতাংশ। ৭৭ সালে যেভাবে ইন্দিরা গান্ধীর জরুরী অবস্থায় জারির বিরুদ্ধে মানুষ তার ভোটাধিকার প্রয়োগ করেছিল তার সাথে তুলনা করা যেতে পারে এবারের নির্বাচনকে। সি পি আই (এম) দলের ৩২ বছরের শাসন, স্বৈরাচারী নীতি, বৃহৎ পুঁজির নির্লজ্জ দালালির বিরুদ্ধে মানুষ তার ভোটাধিকার প্রয়োগ করেছে। প্রশ্ন আসবে সি পি আই (এম) দলের যে নীতির বিরুদ্ধে মানুষ ভোট দিল সেটা কি নতুন? না নতুন নয়। কিন্তু বিগত তিন বছরে এরাজ্যের গণআন্দোলন বহু মানুষকে সাহস জুগিয়েছে। সিঙ্গুর-নন্দীগ্রামের আন্দোলন, লালগড়ের লড়াই, রেশনকান্ড প্রভৃতি ঘটনায় সি পি আই (এম) দলের স্বৈরাচারী বর্বর প্রবনতার বিরুদ্ধে মানুষ প্রতিবাদী হয়েছেন-প্রতিরোধ করেছেন। এবং এটা ঘটনা এই লড়াইগুলো গণআন্দোলনের এক নতুন বাতাবরণ তৈরী করেছে। এর উপর ভিত্তি করে সি পি আই (এম) দলের বিরুদ্ধে মানুষ তার ক্ষোভ উগরে দিয়েছে। অবশ্যই সমাজে সংগ্রামী বামপন্থার নেতৃত্বে একটি সঠিক রাজনৈতিক প্রক্রিয়া অনুপস্থিতির জন্য ভোটের বাক্সে মানুষের ক্ষোভ-বিক্ষোভের পুরো ফায়দা তুলেছে তৃণমূল কংগ্রেস-কংগ্রেস জোট। যদিও একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় তৃণমূল কংগ্রেস-কংগ্রেসের জোট বেশী আসন পেলেও মানুষ ভোট দিয়েছে প্রধানত সি পি আই (এম) এর বিরুদ্ধে। সি পি আই (এম) দলের নেতৃত্বাধীন বামফ্রন্টের পরাজয় অবশ্যই গণআন্দোলনের পক্ষে ইতিবাচক ঘটনা। কিন্তু পাশাপাশি একথাও মনে রাখতে হবে যারা জিতেছে তাদের সাথে সি পি আই (এম) দলের নীতির মৌলিক তফাৎ নেই। অর্থাৎ কেন্দ্রে কংগ্রেসী সরকারের সাথে জোটে রয়েছে তৃণমুল কংগ্রেস— যে কংগ্রেস সরকার, সাম্রাজ্যবাদী, বিশ্বায়নী নীতিকে আরো জোরের সাথে বাস্তবায়িত করবে। এরাজ্যেও তার ব্যতিক্রম হবে না। সুতরাং যে পরিবর্তন হয়েছে তা এরাজ্যে কোনো মৌলিক পরিবর্তন নয়। একমাত্র গণ আন্দোলনের পক্ষে কিছু ইতিবাচক অবস্থা গড়ে উঠেছে। সুতরাং এই অবস্থায় সাম্রাজ্যবাদী ,বিশ্বায়নী নীতির বিরুদ্ধে, জনগনের উপর সমস্ত আক্রমনের বিরুদ্ধে, জনগনের মৌলিক দাবীদাওয়াগুলিকে নিয়ে জনগনকে সংগঠিত করতে হবে। বাঘকে ঠেকাতে গিয়ে নেকড়েকে ডেকে আনা নয়। স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতার জন্য, সাম্রাজ্যবাদ ও বৃহৎ পুঁজির বিরুদ্ধে জোরালো আন্দোলন গড়ার উদ্যোগ নিতে হবে। অবিলম্বে এই কাজে দায়িত্ব নিতে হবে সংগ্রামী বাম ও গনতান্ত্রিক শক্তিকে।

যৌথবাহিনী লালগড়ে

১ পৃষ্ঠার শেষাংশ

সিপিআই (মাওবাদী)- র রাজনীতিকে মোকাবিলা করার কথা বললেও তারপর এই আইন রাজ্যেও লাগু হচ্ছে বলে জানায় এবং ধরপাকড় শুরু করে। এই নিষিদ্ধকরণের ঘোষণা ও গত বছর পাশ হওয়া সন্ত্রাসদমন আইন নামক কালাকানুন প্রয়োগের বিরুদ্ধে সমাজের সমস্ত গণতন্ত্রপ্রিয় মানুষ ও সংগঠনের সোচ্চার হওয়া প্রয়োজন। অথচ সংসদীয় সমস্ত দলগুলো এপ্রশ্নে নীরবতা পালন করছে। এপ্রসঙ্গে কেন্দ্র সরকারের অংশীদার তৃণমূল কংগ্রেসের ভূমিকায় দিশাহীনতা প্রকট। সিপিআই(মাওবাদী)র তরফে এই প্রশ্ন তোলা হয়েছে যে, তারা নন্দীগ্রামের আন্দোলনে তৃণমূল কংগ্রেসকে সহায়তা করেছিল, অথচ এখন সিপিএমের বিরুদ্ধে লড়ার জন্য তাদের ওপর দমনপীড়ণ নামাছে কেন্দ্র সরকার। অন্যদিকে যে শিল্পী-সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবীরা রাষ্ট্রীয় বাহিনীর সন্ত্রাস দেখে লালগড় চলে যান, সমাধানসূত্র বের করার উদ্যোগ নেন, দুপক্ষকে সন্ত্রাস থেকে বিরত থেকে আলোচনার উপযোগী পরিবেশ গড়ে তোলার আহ্বান রাখেন, তাদের বিরুদ্ধেই থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে।

এই আন্দোলন শুরুর দিকে বিস্তীর্ণ অঞ্চলে আদিবাসী মানুষদের মধ্যে ব্যাপক আলোড়ন তৈরী করে। পুলিশী নির্যাতনকে কেন্দ্র করে আন্দোলন শুরু হলেও, আদিবাসী সমাজের অনুন্নয়নের প্রশ্নটা তীব্রভাবে সামনে চলে আসে। পরবর্তীতে গড়ে ওঠে পুলিশী সন্ত্রাসবিরোধী জনসাধারণের কমিটি, যাদের নেতৃত্বে আন্দোলন চলতে থাকে। এই আন্দোলনে ব্যাপক জনগণের ভূমিকা যেমন রয়েছে, তেমনই সংগঠিত শক্তি হিসেবে আন্দোলনের পিছনে সিপিআই(মাওবাদী) তাদের ভূমিকা ক্রমশঃ বাড়িয়ে তোলে। কিন্তু বিভিন্ন মহল থেকে তাদের ভূমিকা সম্পর্কে সমালোচনা উঠেছে। তাদের তরফ যেসমস্ত ঘটনা ঘটানো হয়েছে সেসম্পর্কে, বা সামগ্রিকভাবে তাদের লাইন সম্পর্কেই গভীর পর্যালোচনা প্রয়োজন। বিপুল গণআন্দোলনের সম্ভাবনাকে বিকশিত করার এটাই রাস্তা কিনা, লালগড় আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে মেহনতী জনতার মুক্তিকামী শক্তিগুলির সে বিষয়ে চর্চা প্রয়োজন।

কি করে বাঁচবে সুন্দরবন ?

১ পৃষ্ঠার শেষাংশ

করেছেন। সুন্দরবনের বহু মানুষের মনে এই ভাবনাও দেখা দিয়েছে যে, সুন্দরবন বোধহয় বাঁচবে না। আজ হোক বা কাল, সুন্দরবনকে গ্রাস করে নেবে সমুদ্র। ইতিমধ্যেই বেশ কিছু দ্বীপ বিলীন হয়ে গেছে। যেমন—রাক্ষসখালি, গোবর্ধনপুর, গোপালগঞ্জ, মেরীগঞ্জ, পারগুমটির অর্ধেকটা, এরকম আরও অনেক। সমুদ্রের জল বাড়ছে, আর নতুন নতুন জায়গা জলের তলায় চলে যাচ্ছে। এমনিতেই সুন্দরবন সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে প্রায় ১১ ফুট নীচে, টানা নদীবাঁধ দিয়ে তাকে রক্ষা করা হয়।

বিশেষজ্ঞরাই ভালো বলতে পারবেন কেন এবার এত ক্ষয়ক্ষতি হল। যদিও বিশেষজ্ঞদের মধ্যেও মতপার্থক্য আছে। তবে আমার যে যে বিষয়গুলো মনে হয় তা হল—এক, এবারে জলের উচ্ছাস ও গতি অত্যধিক ছিল। দুই, নদীবাঁধগুলোর উচ্চতা প্রয়োজনের তুলনায় কম। মূল বাঁধের উচ্চতা ১১ থেকে ২২ ফুটের মধ্যে হতে হবে। কারণ নদী থেকে ভূমি ১১ ফুট নীচে। ত্রিস্তর বাঁধ নির্মাণ করতে হবে। মূল বাঁধের দুধারে ২০০ থেকে ২৫০ ফুট জমি ছেড়ে রাখতে হবে। বাঁধ মেরামতি মাটি স্থলের দিক থেকে নতে হবে, নদীর দিক থেকে নয়। তিন, ছোট নদীগুলোর সংস্কার হয়না, ওগুলো প্রায় মজে যাচ্ছে। ঠিক থাকলে ছোট নদীগুলো বড় নদীর জল অনেকটাই টেনে নিতে পারে। গোমতী, দুর্গাদোয়ারী, পাঠানখালি, কুড়েখালি ইত্যাদি নদিগুলো এখন খালেরও অধম হয়ে গেছে। আর তার ফলে বড় নদীগুলো হয়ে উঠেছে ভয়ংকর। চার, সুন্দরবনের অধিকাংশ মানুষ নিতান্তই গরীব। সরকার উন্নয়নের কথা বললেও গরীব মানুষের কথা ভাবেনি। এবারের বন্যায় পাকা ঘরগুলো কিন্তু বেঁচে গেছে। যেহেতু অধিকাংশ মানুষের কুঁড়েঘর, মাটির ঘর—তাই মানুষ সর্বস্ব খুইয়েছেন।

বিশেষজ্ঞরা, যারা বলছেন কিছু দ্বীপ থেকে মানুষকে সরিয়ে নিয়ে সেখানে জোয়ারভাটা খেলতে দেওয়া দরকার যাতে আরও পলি জমে দ্বীপগুলো উঁচু হয়। এই বিষয়টিও ভাববার মত। একটা অভিজ্ঞতার কথা বলি। সুন্দরবনের যে দ্বীপগুলিতে মানুষ থাকে, সেগুলোর বসতি বহু পুরনো, অনেক দিন আগে সেখানে বাঁধ দেওয়া হয়েছিল এবং তার ফলে দ্বীপগুলো যথেষ্ট উঁচু হয়নি। অথচ মরিচঝাঁপিতে যখন ১৯৭৮-এ মানুষ বসতি স্থাপন করেছিল, তখন তাদের নদির জল আটকানোর জন্য এরকম উঁচু বাঁধ দিতে হয়নি, সামান্য আলের মত নীচু বাঁধেই কাজ চলেছিল। কারণ অন্য দ্বীপগুলোর তুলনায় মরিচঝাঁপি অনেক উঁচু, এত বছর ধরে সেখানে পলি পড়ার সুযোগ ছিল বলে। পরে সরকার মরিচঝাঁপির মানুষদের কিভাবে উৎখাত করেছিল, সে তো আরেক ভয়াবহ কাহিনী।

কিন্তু প্রশ্ন হল, এই আর্থসামাজিক ব্যবস্থায় এই দ্বীপ থেকে দ্বীপে গোটা জনবসতির স্থানান্তর কি আদৌ সম্ভব? বিরাট গণউদ্যোগ ছাড়া, প্রকৃত জনগণের ব্যবস্থা ছাড়া এই কাজ কতটা কি করা যাবে তা নিয়ে ঘোরতর সন্দেহ রয়েছে। অথচ এটা করতে পারলে যে সবচেয়ে ভালো হত, এবিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

সুন্দরবন এক পুরনো সভ্যতা। সুন্দরবন বাংলার ফুসফুস। সুন্দরবনকে আমাদের বাঁচাতেই হবে।

এবারে একটা জিনিস লক্ষ্যণীয়। বহু মানুষ এবার সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। যারা সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন, তাঁদের সবাইকে সুন্দরবনের মানুষদের পক্ষ থেকে কৃতজ্ঞতা জানাই।

আমরা মজদুর ক্রান্তি পরিষদের (এমকেপি) পক্ষ থেকে ঝড়ের পরদিন থেকেই ত্রাণকার্য চালাচ্ছি। এই কাজে আমাদের সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন বহু মানুষ, আমাদের সংগঠনের অন্যান্য জেলার কমরেডরা, এবং বিভিন্ন সংগঠন। শ্রমজীবী স্বাস্থ্য উদ্যোগের ডাক্তার ও স্বাস্থ্যকর্মীরা মেডিকেল ক্যাম্প করে গেছেন প্রত্যন্ত জায়গাগুলিতে। মেডিকেল ক্যাম্প চালিয়েছে পিডিএসএফের ডাক্তাররা। যুবভারত, অহল্যা, বিভিন্ন ক্লাব সংগঠন, ছোট ব্যবসায়ী সংগঠন ত্রাণের কাজে সাহায্যের হাত বাড়িয়েছেন অকাতরে। বন্ধ কারখানার শ্রমিক থেকে শুরু করে সফটওয়্যার ইঞ্জিনীয়াররা কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে ত্রাণের কাজে এসেছে এখানে।

সুন্দরবনের বিস্তীর্ণ এলাকায় আমরা ত্রাণকার্য চালানোর পাশাপাশি নির্দিষ্ট দাবীতে গণ আন্দোলন গড়ে তোলার প্রচেষ্টা চালাচ্ছি। মুখ্যমন্ত্রী যোগেশগঞ্জের বন্যা দুর্গত অঞ্চলে এলে আমরা এমকেপির তরফ থেকে মিছিল সহযোগে স্মারকলিপিও পেশ করি। আমাদের আশু দাবী—

১। আয়লায় ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলিকে পূর্ণ পুনর্বাসন বাবদ ৫০,০০০ টাকা এবং আংশিক পুনর্বাসন বাবদ ২৫,০০০ টাকা করে দিতে হবে।

২। পরিবার পিছু একটি করে পাকাবাড়ি নির্মাণ করে দিতে হবে।

৩। কৃষকদের ধানচাষের জন্য প্রয়োজনীয় বীজপাতা সরকারকে সরবরাহ করতে হবে।

৪। নতুন ফসল না হওয়া পর্যন্ত মানুষের খাওয়ার দায়িত্ব সরকারকে নিতে হবে।

৫। নোনাজল নিষ্কাশনের ব্যবস্থা অবিলম্বে সরকারকে করতে হবে।

৬। শিক্ষা-স্বাস্থ্যের দায়িত্ব পুরোপুরি সরকারকে নিতে হবে।

এইসব আশু দাবীর পাশাপাশি রয়েছে বিজ্ঞানসম্মত বাঁধ নির্মাণ ও মিঠে জল সংরক্ষণের স্থায়ী ব্যবস্থা গ্রহণের দাবীসমূহ।

এই দাবীগুলো নিয়ে আজ গোটা সুন্দরবনের মানুষকে সোচ্চার হতে হবে। সুন্দরবনের সমস্যা কোন বিচ্ছিন্ন সমস্যা নয়, এই আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থার সীমাবদ্ধতাই আজ সুন্দরবনের মানুষের সমস্যাকে আজ গভীরতর করে তুলেছে। ফলে এতে সবার অংশগ্রহণ জরুরী। সিঙ্গুর-নন্দীগ্রামের লড়াইয়ে যেমন সারা বাংলার মানুষ পাশে দাঁড়িয়েছিলেন, আজ সুন্দরবন ও সেখানকার মানুষকে বাঁচানোর লড়াইয়ে রাজ্যের অন্যান্য জায়গার মানুষের অংশগ্রহণ তেমনই জরুরী।

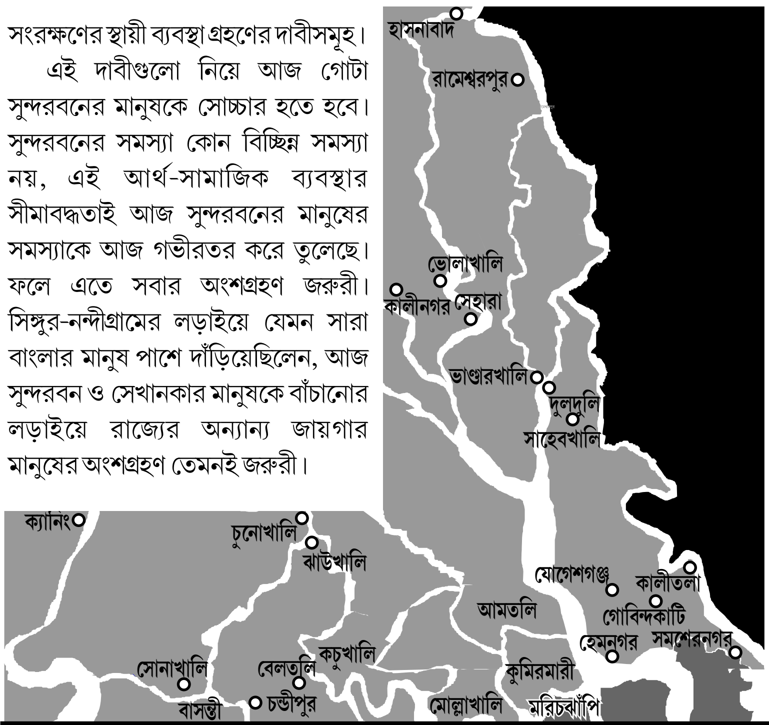

এটাই রাস্তা: যোগেশগঞ্জের হেমনগরে

ধামাখালি রাজ্য সড়ক

গোসাবার চণ্ডীপুরে

ত্রাণের প্রতীক্ষায়: কুমীরমারি

মোল্লাখালি

কচুখালি ৪ নং

মেডিকেল ক্যাম্প: সমশেরনগরে শ্রমজীবী স্বাস্থ্য উদ্যোগ(বাঁদিকে), হেমনগরে(মাঝে), আয়লার পরের দিন এমকেপির ত্রাণবন্টন

জীবনের জন্য: কলকাতায়

বাঁচবো, বাঁচবো রে আমরা: ভান্ডারখালি

আর এক আরম্ভের জন্য: সন্দেশখালি

ভান্ডারখালি

আয়লা রোখার কাহিনী

নিজস্ব প্রতিবেদন: গৌড়েশ্বর আর রায়মঙ্গল নদী যেখানে মিশেছে, সেখানেই একটা পাড়ে ভান্ডারখালি। উত্তর ২৪ পরগণার দুলদুলি পঞ্চায়েতের একটা এলাকা এই ভাণ্ডারখালি। রায়মঙ্গলের রূপ এমনিতেই ভয়াবহ, ফলে আয়লার সময় তার রূপ কি হতে পারে তা নিশ্চয়ই কল্পনা করতে পারছেন। অন্যদিকে গৌড়েশ্বর। একসময় সেই নদী দিয়ে লঞ্চ চলত। এখন নাব্যতা কমে গেছে ভীষণভাবে, চর জেগে উঠেছে জায়গায় জায়গায়। ফলে জল বাড়লে বাঁধ ছাপিয়ে ডাঙ্গায় জল ঢুকে পড়াটাই স্বাভাবিক। অথচ আয়লার মতন বিধ্বংসী ঝড় এবং জলস্ফীতির পরেও ভাণ্ডারখালি অঞ্চলের একটা বিস্তীর্ণ এলাকায় জল ঢোকেনি। গোটা সুন্দরবন যখন বিধ্বস্ত তখন ভাণ্ডারখালির এই অঞ্চলে পৌঁছে আমরা অবাক হয়ে যাই। ঘাট থেকে বাজার, বাজার থেকে পাড়াগুলো কিম্বা ধানক্ষেত বেঁচে গেছে আয়লার তাণ্ডব থেকে। কি করে বাঁচলো? শুনলাম এক অবিশ্বাস্য কাহিনী।

“এখানে একটা শেড ছিলো। শেডটা আমি অকশানে নিয়েছিলাম। অকশানের টিনগুলো আমার বাড়িতে ছিল।”... বলছিলেন যিনি, তিনি দুলদুলি ঘাটে পারাপারের ভাড়া সংগ্রহ করেন। ...“সেই টিন দিয়েই নদীর বাঁধটাকে বাঁচানো গেছে।” মানে? ব্যাখ্যা করলেন দরজির দোকানে বসে থাকা যুবক—“দোকানে কাজ করছিলাম, তারপর মাঠের ধারে গেলাম। গিয়ে দেখি একদম বিপর্যয়। মানে জল ঢুকবেই, বাঁধ ভেঙে যাচ্ছে। আমরা প্রায় ৫০-৬০ টা টিন নিয়ে পঞ্চাশ-ষাট জন ছেলে জলের মধ্যে গলা পর্যন্ত ডুবে পাঁচ ঘন্টা বাঁধের ধারে নদীর ঢেউ ভেঙেছি, যাতে বাঁধের বেশী ক্ষতি না হয়। ঢেউ আসছে, টিনে লেগে কেটেকুটেও যাচ্ছে, কিন্তু সেসব দেখার কোনো অবস্থা নেই। পাঁচ ঘন্টার টানা চেষ্টার ফলে বাঁধটা কোনোমতে বাঁচাতে পেরেছি। আমার বাড়ি থেকে কিছুটা ছাড়িয়ে গিয়ে ওখানে জল ওভার-ফ্লো করছিল, ওখানে মানুষ বসে বসে জোয়ারের জলটা পিঠে খেয়েছে, ভাবুন... পরপর বসে আছে মানুষ... জলের দিকে পিঠ দিয়ে, আর সেই সুযোগে ঐ ভাঙ্গা জায়গাটা মেরামত করা হচ্ছে। সে বিরাট একটা ব্যাপার, মানে জোয়ার কমছেই না, জোয়ার কমার সময় হয়ে গেছে, তবু জল নামছে না। ভেড়ির উপরে একটা ইটের রাস্তা ছিল, সেটা ওভার-ফ্লো করে জল আসছিল। গ্রামের লোকে...প্রচুর মানুষ..প্রচুর... প্রথমে মাটি ফেলে আটকাবার চেষ্টা করে, মাটি দিয়ে যখন হচ্ছে না তখন বস্তা ফেলা হয়। কোথাও কোথাও যেখানে মাটি বসে যাচ্ছিল, সেখানে সঙ্গে সঙ্গে পাইলিং করা হচ্ছিল। এভাবে বাজারটাকে বাঁচানো হয়েছে, না হলে বাজারটা বাঁচতো না। তারপর যখন জোয়ার নামলো, তখন আরেকবার পুরোদস্তুর বাঁধ মেরামত করা হল। সেসব এখন ভাবা যায় না... বাজারে যত বস্তা ছিল, সব নিয়ে গিয়ে মাটি ভরা হচ্ছে আর ফেলা হচ্ছে। শুধু সিমেন্টের বস্তা নয়, যত কয়লার বস্তা, নুনের বস্তা, সফেদের বস্তা—যার যা ছিল সব নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

তারপর ওখানে যা জল ছাপিয়ে এসেছিল, সেসব বের করার জন্য টানা পাঁচ দিন পাম্প চালিয়ে, দিনরাত আমরা ওখানেই থেকেছি... খাওয়া ওখানে, ঘুম ওখানে... সে যা দিন গেছে!”

আমরা জিজ্ঞাসা করলাম, এসব করতে গিয়ে মানুষ অসুস্থ হয়েপড়েনি?

“অসুস্থ? ওসব ভাবারই টাইম ছিল না। কেটেকুটে গেছে অনেকের। আর কেউ কেউ যখন দুর্বল হয়েপড়ছিল, তাদেরকে গরম দুধ খাইয়ে চাঙ্গা করা হচ্ছিল, তারপর আবার তারা নেমে পড়ছে কাজে। যে যেখানে ছিল, সে সেখান থেকে নড়েনি।”

আপন মনে সেলাই করতে করতে তখন বলে চলেছে ও, “আমরা যে সুন্দরবনের মানুষ, সেদিন প্রমাণ হয়ে গেছে। পাঁচ ঘন্টা ধরে জলের ঢেউয়ের মধ্যে ডুবে আছি, পায়ে নোনাপোকা কামড়াচ্ছে, সাপও আসছে। আমরা ভেবে নিয়েছিলাম, আমরা ৫০-৬০ টা ছেলে মরে গেলেও কিছু না, গ্রামটা তো বাঁচবে, গ্রামের মানুষ বাঁচবে। বুঝলেন তো, আমরা সুন্দরবনের মানুষ, বাঘে-মানুষে লড়াই করে আমরা বেঁচে থেকেছি।”

কোটালে আবার বাঁধ ভাঙ্গলো

সোনাখালি সহ বিভিন্ন এলাকায় ভাঙ্গচুর, প্রহার কর্তাদের

নিজস্ব প্রতিনিধি: গত ২৪ শে জুন কোটালে আবার বাঁধ ভেঙ্গে জল ঢোকায় বিপদাপন্ন হয়ে পড়লেন সুন্দরবনের বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষ। সোনাখালির হোগলডুরি ও নাপিতখালি এলাকার ক্ষিপ্ত মানুষ বিডিওর সাথে দেখা করতে গেলে বিডিও দেখা করতে অস্বীকার করে। প্রায় এক হাজার গ্রামবাসী বিডিও অফিস ভাঙ্গচুর করে। বাঁধ নির্মাণে গাফিলতি এবং প্রশাসন-প্রতিষ্ঠিত রাজনৈতিক দল-কন্ট্রাক্টরদের দুর্নীতির বিরুদ্ধে বহু জায়গায় ক্ষোভের আগুন জ্বলছে। বাসন্তী, রাঙ্গাবেলিয়া, সন্দেশখালি-১ এলাকাতেও পঞ্চায়েত ও ব্লক অফিসে বিক্ষোভ ও কর্তা-নেতাদের প্রহারের ঘটনা ঘটে।

 Declaration No. 178/04; 18.11.04

<u>৫০ জনের মৃত্যু, অবশেষে কালা আইন স্থগিত</u>

জল-জঙ্গল-জমিরক্ষার প্রবল লড়াই পেরুতে

বিশেষ প্রতিবেদন: বলা হচ্ছিল এটা পৃথিবীর দ্বিতীয় তেল যুদ্ধ, ইরাক যুদ্ধেরপর। উত্তর পেরুর জঙ্গলে একদিকে আধুনিক অস্ত্রে সজ্জিত পুলিশ। তাদের সাথে হেলিকপ্টার, টিয়ার গ্যাস, স্বয়ংক্রিয় রাইফেল আর অন্যদিকে কয়েক হাজার আওয়াজুন ও ওয়াম্বিস ইন্ডিয়ান, ওখানকার স্থানীয় আদিবাসী মানুষ। গত বিশ বছরের মধ্যে পেরুর সবচেয়ে ভয়াবহ সংঘর্ষের ঘটনাটা ঘটে গেল সম্প্রতি। আদিবাসীদের তরফ থেকে একথাটা আগেই বলা হয়েছিল যে কোম্পানীগুলোকে যদি এভাবে অবাধে আমাজনের জঙ্গলের কাঠ আর তেল লুঠ করার অধিকার দেওয়া হয়, তাহলে এরকম সংঘর্ষ অনিবার্য। বহু মাস ধরে শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদ আন্দোলন চলছিল। অবশেষে পুলিশকে অর্ডার দেওয়া হল রাজধানী লিমার থেকে ১০০০ কিমি উত্তরে বাগুয়ার কাছে একটা জায়গায় রাস্তা অবরোধ ভাঙতে বলপ্রয়োগ করার। আর তারপরেই শুরু হয়ে গেল সেই ঐতিহাসিক প্রতিরোধ। এখনও পর্যন্ত ৫০ জন আদিবাসী ইন্ডিয়ান ও ৯ জন পুলিশ এই সংঘর্ষে নিহত হয়েছেন।

অন্যদিকে এই আন্দোলনের সমর্থনে, ইন্ডিয়ানদের লড়াইয়ের সংহতিতে পেরুর অন্যান্য শহরে একের পর এক মিছিল বেরোতে থাকে। লিমাতে ছাত্র, শ্রমিক এবং পেরুর জনগণ মিলিয়ে প্রায় কুড়ি হাজারের এক প্রতিবাদী মিছিল যখন সরকারী অধিবেশনের বাইরে উপস্থিত হয় তখন পুলিশী প্ররোচনায় দাঙ্গা বেধে যায়। পুলিশের পক্ষ থেকে টিয়ার গ্যাস ফায়ার করা হয় এবং দাঙ্গায় প্রায় পঞ্চাশ জনের মৃত্যু হয়। প্রতিবাদকারীদের অভিযোগ যে এখনও প্রায় ১০০ জন প্রতিবাদী নিরুদ্দেশ।

অবশেষে গণআন্দোলনের ফলে বাতিল হয়ে গেল পেরুর জমি অধিগ্রহন সংক্রান্ত আইন। প্রবল জনরোষের সম্মুখীন হয়ে সে দেশের প্রেসিডেন্ট অ্যালান গার্সিয়া জমি অধিগ্রহন সংক্রান্ত দুটি আইন বাতিল করতে বাধ্য হন। সরকারী পক্ষ থেকে বলা হয়েছে সংসদে ভোটাভুটির মাধ্যমে আইন দুটি ৯০ দিনের জন্য স্থগিত রাখা হয়েছে। যদিও আন্দোলনকারীদের দাবী ছিল আইনগুলিকে স্থায়ীভাবে বাতিল করার। পেরুর প্রতিবেশী রাষ্ট্র বলিভিয়ার সাথে এবিষয়ে সমস্যা তৈরী হয়েছে, কারণ বলিভিয়ার প্রেসিডেন্ট ইভো মোরালেস ইন্ডিয়ানদের আন্দোলনকে সমর্থন জানিয়েছেন। তার মতে আমেরিকার সাথে মুক্ত বাণিজ্যের চুক্তিতে জড়িয়ে যাওয়ারপরিণতি এটাই।

অ্যালান গার্সিয়ার এই ইতিহাস নতুন নয়। ১৯৮৬-র জুনে তিনি জেলের অব্যবস্থার বিরুদ্ধে রাজনৈতিক বন্দীদের প্রতিবাদ-বিক্ষোভের ওপর রাষ্ট্রীয় দমন-পীড়ণ নামিয়ে আনেন। বোমাবাজি করে সেনাবাহিনী, যার ফলে মৃত্যু হয় চারশো জনের। এহেন গার্সিয়া মাঝে কিছু বছর স্বেচ্ছা নির্বাসনে গেলেও আবার মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের বদান্যতায় ২০০৬ সালে টাকা এবং মিডিয়ার ওপর দখলদারির জোরে আবার প্রেসিডেন্টপদে ফিরে আসে, এবং তার পরিণতি আমরা দেখতে পাচ্ছি। যেমন আমরা দেখছি এপ্রশ্নে ওবামার নীরবতা, গার্সিয়ার প্রতি নীরব সম্মতি। বুশের সময় গৃহীত নীতিগুলিই চলছে, 'নর্থ আমেরিকান ফ্রি ট্রেড এরিয়া'(নাফটা)-র নীতিমালা। রূপায়ন করছে ওবামার প্রশাসন।

আমেরিকাতে অভূতপূর্ব বেকারত্বের হার

বিশেষ প্রতিবেদন: আমেরিকাতে বেকারত্বের হার সর্বোচ্চ জায়গায় দাঁড়িয়েছে। ১৯৩০-এর গ্রেট ডিপ্রেশনের পর এত বেকারত্ব দেখা যায়নি কখনো। ডিসেম্বর ২০০৭ থেকে এবছরের মে মাস পর্যন্ত কাজ হারিয়েছেন ৬০ লক্ষ শ্রমিক। কিংবদন্তী তিনটি অটোমোবাইল কোম্পানী ফোর্ড, ক্রাইসলার ও জেনারেল মোটর্স বন্ধ হয়ে গেল। এক-একটা প্রজন্ম এই স্বপ্ন নিয়ে বড় হয়েছে আমেরিকাতে, যে এই তিনটে কোম্পানীর কোন না কোনটাতে চাকরি মিলবে। ভারী যন্ত্র প্রস্তুতকারক ক্যাটারপিলার, ব্যাঙ্কিং সংস্থা সিটিগ্রুপ, অ্যালুমিনিয়াম কোম্পানী অ্যালকোয়া, কম্পিউটার প্রস্তুতকারক ডেল এবং প্রখ্যাত ডিএইচএল প্রচুর শ্রমিক ছাটাই করেছে। সার্কিট সিটির মত খুচরো ইলেক্ট্রনিক সামগ্রী বিক্রেতা উঠে গেছে, ৪০০০০ শ্রমিক বেকার হয়েছে তার ফলে। বিভিন্ন কোম্পানীর সাথে যুক্ত উকিলরাও কাজ হারাচ্ছেন।

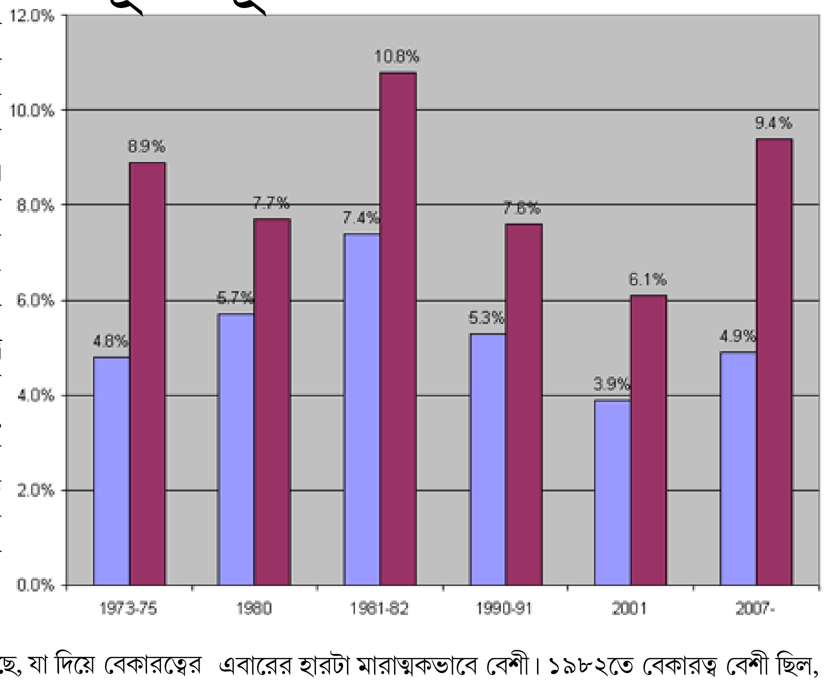

ইউ-৩ নামক এক হিসেব করার পদ্ধতি আছে, যা দিয়ে বেকারত্বের হিসেব করা হয়। তাতে মন্দার শুরুতে বেকারত্বের হার ও যে সময়ে হিসেব করা হচ্ছে, তার একটা তুলনা করা হয়। এতে দেখা যাচ্ছে, যে এবারের হারটা মারাত্মকভাবে বেশী। ১৯৮২তে বেকারত্ব বেশী ছিল, কিন্তু বৃদ্ধির হার এত বেশী ছিল না, অচিরেই এবারের মাত্রা আরও ভয়াবহ হয়ে উঠবে বলে বিশেষজ্ঞদের আশংকা।

পশ্চিম দুনিয়ায় অশান্ত মে মাস

ঈপ্সিতা সামন্ত: এক অভূতপূর্ব পয়লা মে পালন করলেন ইউরোপ-আমেরিকার শ্রমিকরা। ২০০৬ সাল থেকে শুরু হওয়া বিশ্বমন্দার প্রবল ধাক্কায় বিশ্বজুড়ে পুঁজিপতিরা যখন লাখে লাখে শ্রমিকদের হাত থেকে বেঁচে থাকার ন্যূনতম উপায়টাও কেড়ে নিচ্ছে তখন যেখানকার শ্রমিকরা এবার শুরু করেছেন পাল্টা আক্রমণ। আর তার উপযুক্ত সময় হিসাবে বেছে নিয়েছিলেন এবারের পয়লা মে দিনটিকে। ইউরোপ আমেরিকার লাখে লাখে শ্রমিক ঐ দিন দিনভর ব্যাপক বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন এবং আওয়াজ তোলেন— পুঁজিতান্ত্রিক শোষণের অবসান চাই।

বলা হচ্ছিল সব সামলে নেওয়া যাবে। মন্দা স্থায়ী হবে না। কিন্তু আশ্বাসের

মে দিবস উদযাপন: আমেরিকায়

সমস্ত বুজরুকিকে উড়িয়ে দিয়ে পশ্চিম দুনিয়ায় মন্দা গভীরতর হচ্ছে। ২০০৮ সালের মধ্য সেপ্টেম্বরে লেহম্যান ব্রাদার্স দেউলিয়া হয়ে যাওয়ার সাথে সাথে অবস্থা চরমে ওঠে। একের পর এক ব্যাঙ্ক দেউলিয়া হয়ে যায়। ভোগ্যপণ্যের চাহিদা তলানিতে ঠেকে। শুরু হয়ে যায় অবিশ্রান্ত ছাঁটাই। এ বছর জানুয়ারি থেকে মে— এই পাঁচ মাসে আমেরিকার নতুন করে বেকার হয়েছেন ৫৬ লক্ষ শ্রমিক। একই রকম ভয়ংকর অবস্থা ইউরোপেও। এরই মধ্যে কোম্পানীগুলিকে বাঁচাতে সরকারের দেওয়া ত্রাণের পয়সা নিয়ে শুরু হয়েছে মোচ্ছব। ট্যাক্স হিসাবে দেওয়া জনগণের এই কষ্টার্জিত পয়সা এই বাজারেও বোনাস বা শেয়ারের লভ্যাংশ দেখিয়ে লুটে নিচ্ছে কোম্পানিগুলির কর্তাব্যক্তিরা।

ইউরোপ এবং আমেরিকা জুড়ে শ্রমিক বিক্ষোভ চলছিলই। মে মাসে তা

মিত্তালদের লুক্সেমবুর্গ কারখানা দখল করলেন শ্রমিকরা

উত্তাল হয়ে ওঠে। জঙ্গী বিক্ষোভের মাধ্যমে পয়লা মে পালন করেন ঐ দুই মহাদেশের কয়েক কোটি শ্রমিক। মিত্তালের লুক্সেমবার্গ-এর কারখানা দখল করে নেন শ্রমিকরা। ছাঁটাইয়ের খবরের ক্ষিপ্ত হয়ে থ্রিএম নামের একটি আমেরিকান কারখানার কর্তাদের অনির্দিষ্টকালীন ঘেরাও করেন ফ্রান্সের শ্রমিকরা। ফ্রান্সের আর একটি কোম্পানী কন্টিনেন্টাল এজি-র শ্রমিকরা প্রেসিডেন্ট ভবনে মিছিল করে যাওয়ার সময়ে একের পর এক গাড়িতে আগুন ধরিয়ে দেন। স্কটল্যান্ডে শ্রমিকরা ভাঙ্গচুর চালায় রয়াল ব্যাঙ্ক অব্ স্কটল্যান্ড-এর অধিকর্তা ফ্রেড গুডউইনের বাড়িতে। ব্যাঙ্ক ডুবে গেলেও উনি নাকি বছরে সাত লক্ষ পাউন্ড মাইনে পাচ্ছিলেন। মে মাসে গ্রীসে একের পর এক আর্থিক প্রতিষ্ঠানে ভাঙ্গচুর চালায় শ্রমিকরা।

গোটা পশ্চিম দুনিয়ার রাজপথে আজ শ্রমিক বিক্ষোভ প্রতিদিন অশান্ত হয়ে উঠছে। শ্রমিকের লাল ঝাণ্ডায় মুড়ে দেওয়া হচ্ছে এক একটি দিন। পৃথিবী জুড়ে শ্রমিক শ্রেণি তৈরি হচ্ছে রাজ বদলের সংগ্রামে।

ব্রিটেনে ধনী-গরীবের বৈষম্য সর্বোচ্চ শিখরে

গত মাসে প্রকাশিত হল বিভিন্ন দেশের মানুষের আথির্ক বৈষম্য সংক্রান্ত তথ্যাবলী। গিনি কোএফিসিয়েন্ট নামক এই হিসেবে ০ থেকে ১ এর মধ্যে মান নির্ধারিত হয়। শূন্য হওয়ার মানে অর্থ সুষমভাবে বন্টিত, আর ১ হওয়া মানে কোন একজনের হাতে সমস্ত সম্পদ কুক্ষিগত হয়ে আছে।

দেখা যাচ্ছে, ব্রিটেনের ক্ষেত্রে এই মান এখন ০.৩৬, যা থ্যাচারের জমানায় ছিল ০.২৫। ইউরোপের বিচারে এই হিসেব অনেকটাই বেশী। সুইডেনের ক্ষেত্রে ০.২৩, জার্মানীতে ০.২৮৩, ফ্রান্সে ০.৩২৭। আমেরিকাতে এর মান ০.৪০৮। ভারতের ক্ষেত্রে গিনি কোএফিসিয়েন্ট -এর মান ০.৩২৫।

কর্মহীনতার সঙ্কট চলবে ৮ বছর: রাষ্ট্রসংঘের হুঁশিয়ারি

আন্তর্জাতিক শ্রম সংগঠনের বক্তব্য, যে কর্মহীনতার সংকট সারা পৃথিবী জুড়ে শুরু হয়েছে, তা আট বছর পর্যন্ত চলবে। জেনিভাতে রাষ্ট্রসংঘের বৈঠক থেকে এই রিপোর্টের ভিত্তিতে বলা হয়েছে যে এরকম ধারাবাহিক বেকারত্বের সংকট আন্তর্জাতিকভাবে সামাজিক ও রাজনৈতিক ভারসাম্যকে বিনষ্ট করবে।

জেনিভা সম্মেলনে আইএলও-র ডিরেক্টর জেনারেল জুয়ান সোমাভিয়া জানান যে, ২০১০-এর শেষে বা ২০১১ তে বেকারত্বের এই সমস্যায় কিছুটা রাশ টানতে পারে। ২০০৮-০৯ জুড়ে ব্যাপক হারে বিনিয়োগ, ক্রয়, উৎপাদন এবং বাণিজ্য সমান তালে কমেছে।

সারা পৃথিবীতে ২০০৮-এ খুন ৭৮ জন ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠক

বিশ্বজুড়ে আর্থিক মন্দার সাথে সাথে শ্রমজীবি জনতার ওপর আক্রমণও তীব্রতর হয়েছে। বিশ্বজুড়ে আক্রমণের মাত্রা আরও বেড়েছে ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠকদের ওপর। বহু দেশে ট্রেড ইউনিয়নের অধিকার কেড়ে নেওয়া হচ্ছে বা অযাচিত হস্তক্ষেপ চলছে।

অধিকারের লড়াই লড়তে গিয়ে ২০০৮ সালে অন্তত ৭৬ জন ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠক খুন হয়েছেন বলে সম্প্রতি এক রিপোর্টে জানিয়েছে আইএলও এবং আইটিইউসি। শুধু লাতিন আমেরিকাতেই তার মধ্যে ৬৬ জন খুন হয়েছেন। তার মধ্যে সর্বোচ্চ কলম্বিয়াতে। সংখ্যাটা ৪৯, যার মধ্যে ১৬ জন ট্রেড ইউনিয়নের নেতা, যার আবার ৪ জন মহিলা।

সত্ত্বাধিকারী অমিতাভ ভট্টাচার্য কর্তৃক ১১, রাজা রামমোহন রায় সরণী, কলকাতা-৯ থেকে প্রকাশিত ও তৎকর্তৃক বেঙ্গল লোকমত প্রিন্টার্স প্রাঃ লিঃ, ১০বি ক্রিক লেন, কলকাতা-১৪ থেকে মুদ্রিত। **সম্পাদক : অমৃত পৈড়া**